জংগল বাড়ি ঘাটি

রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

জঙ্গল বাড়ি ঘাটি-৬৪

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

পরদিন নীলাকে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবাপন্ন মনে হচ্ছিলো। তার নিজের ঘরে একটি চেয়ারে বসে ভাবছিলো গতরাতের ঘটনা। দস্যু বনহুরের কথাগুলো তার কানের কাছে প্রতিধ্বনি হচ্ছিলো।

হঠাৎ নীলা চিৎকার করে উঠে—না না আমি তোমাকে ভয় করি না দস্যু বনহুর! আমি তোমাকে ভয় করিনা......

বেডটি হাতে সেই মুহূর্তে রংলাল এসে দাঁড়ায়—আপামনি দস্যু বনহুর! কোথায় কোথায় সে?

রংলাল তুমি!

হাঁ আপামনি আপনার বেডটি।

রংলাল......নীলা উদ্ভ্রান্তের মত তাকায় ওর মুখের দিকে। এলোমেলো চুল, ফ্যাকাশে মুখমণ্ডল চোখ দুটো ফ্যাল ফ্যাল করছে যেন!

বললো রংলাল—আপামনি আজ আপনার কি হয়েছে?

কিছুনা।

দস্যু বনহুর এসেছিলো বুঝি?

হাঁ-হাঁ রংলাল।

সত্যি বলছেন আপামনি?

মাথা দোলায় নীলা—হুঁ।

কই কোথায় সে? কোথায় সে আপামনি?

রাতে সে আমার ঘরে এসেছিল।

দস্যু বনহুর আপনার ঘরে এসেছিলো বলেন কি আপামনি।

হাঁ আপনি কি বলছেন আপামনি?

সব সত্য রংলাল! সব সত্য......না না সে কোন কথা কাউকে বলতে মানা করেছে।

আপনি আমাকে বলুন আপামনি সে একটুও জানতে পারবে না।

তুমি তাকে জানোনা রংলাল। দস্যু বনহুর অতি ভয়ঙ্কর মানুষ? যার অসাধ্য কিছু নেই।

তাহলে আপনি কি আপনার রত্ন তাকে দিয়ে দিবেন আপামনি?

না না আমি পারবো না। রংলাল......হঠাৎ নীলা ওর বুকে ঝাপিয়ে পড়ে।

একি করছেন আপামনি?

নীলা ওর বুকে মুখ গুঁজে বলে—রংলাল দস্যু বনহুর তোমাকে হত্যা করতে চায়।

আমাকে দস্যু বনহুর হত্যা করতে চায়।

হাঁ রংলাল। তোমাকে ছিনিয়ে নিতে চায় সে আমার কাছ থেকে।

আমাকে হত্যা করে যদি সে আপনাকে রেহাই দেয় মানে আপনাকে মুক্তি দেয়, তাহলে আমি হাসিমুখে তার কাছে নিজকে সমর্পন করবো।......

তা হয় না। তুমি—তুমি জানো না মনির তুমি আমার স্বপ্ন আমার রত্ন......

আপামনি......

নীলা ছুটে বেরিয়ে যায় তার ঘর থেকে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বনহুর। বিরাট এক সমস্যা তার সম্মুখে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। নীলার সরল সহজ মনকে কি করে সে ফাঁকি দিয়ে চলেছে। নিজের কাছে নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হয় বনহুরের।

ধীরে ধীরে ফিরে আসে বনহুর নিজের কামরায়।

আজ তার ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা ফুটে উঠে না। একটা দুর্বলতা তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। মুক্ত জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বনহুর ভেবেছিলো কান্দাই হত্যা রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে তাকে এতোদূর গড়াতে হলো সে তো চায় নি এমন একটা কিছু হোক। প্রথম যেদিন বনহুর বাগানে কাজ করছিলো তখন নীলাকে গাড়িতে দেখেই কেমন যেন চমকে উঠছিলো। তার চিন্তাধারা গিয়েছিলো এলোমেলো হয়ে। তার জীবনে যদিও এমন সমস্যা বহুবার এসেছে তবু সেদিন কেনো যেন বড় অস্বস্তি বোধ করছিলো মনে মনে। তারপর সত্যি নীলা এলো তার পাশে যা সে ভেবেছিলে প্রথম নজরেই সেই সমস্যা নিয়ে। নিজকে সে কিছুতেই নীলার কাছ থেকে গোপন রাখতে পারলো না। নীলা তাকে প্রথম দৃষ্টিতেই......

বনহুরের চিন্তা জাল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।

কে যেন তার পিঠে মাথা রেখেছে, নিজের মনেই বনহুর ভেবেছিলো নীলা ছাড়া কেউ নয়। মাথাটা ফেরাতেই তার ভাবটা সঠিক হলো, সত্যিই নীলা দাঁড়িয়ে আছে তার পিছনে। শুনতে পেলো ওর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বর মনির।

বলুন আপামনি?

চলো দূরে কোথাও যাই!

আপামনি আপনি কাঁদছেন? ফিরে দাঁড়ালো বনহুর নীলার দিকে মুখ করে।

নীলার রক্তাক্ত গণ্ড আরো রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে। গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

বনহুরের বুকের মধ্যে কেমন অসহ্য একট ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠে, নীলার চোখের অশ্রু তাকে চঞ্চল করে তোলে। হাতখানা এগিয়ে যায় নীলার চোখের পানি মুছিয়ে দেবার জন্য কিন্তু নিজকে সংযত করলেন।

নীলা আঁচলে চোখের পানি মুছে বলে—মনির আমাকে কোথাও নিয়ে চলো। আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে পারছি না।

সে কি আপামনি?

হাঁ মনির। আমি দূরে কোথাও যেতে চাই? চলো আমাকে নিয়ে চলো।

আচ্ছা চলুন।

নীলা নিজকে স্বাভাবিক করে নেবার চেষ্টা করে।

বনহুর তাকিয়ে থাকে ওর অশ্রুসিক্ত মুখ খানার দিকে। আজও নীলার শরীরে ফিকা নীলাভ শাড়ী ব্লাউজ। কানে নীল পাথরের দুটো বল। পায়েও নীল রং-এর জুতো। ভারী সুন্দর লাগছে নীলাকে।

নীলা গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াতেই বনহুর বললো—আপামনি আপনি পাশে বসুন আমি ড্রাইভ করছি।

তুমি!

হাঁ আপামনি আপনি আমায় ক'দিন ধরে শেখালে......কথাটা বলে বনহুর ড্রাইভিং আসনে উঠে বসলেন।

নীলা ও উঠে বসলো তার পাশে।

বনহুর গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো।

গাড়ি চলতে শুরু করলো।

নীলার দু'চোখে বিস্ময়। রংলাল এরি মধ্যে এতো সুন্দর গাড়ি চালানো শিখে ফেলেছে। ভুলে গেলো নীলা সব দুঃখ ব্যথা, ভুলে গেলো রাতে দস্যু বনহুরের সেই কঠিন কথাগুলো।

বললো নীলা—মনির সত্যি তুমি অপূর্ব।

সম্মুখে দৃষ্টি রেখে বললো বনহুর—সবই তো আপনার দান আপামনি।

মনির আমি ভাবতেও পারিনি তুমি এতো তাড়াতাড়ি এমন সুন্দর গাড়ি চালানো শিখতে পারবে। মনির তুমি অদ্ভুত মানুষ......

প্রসঙ্গটা অন্যদিকে ফেরাবার জন্য বনহুর বলে—এখন কোথায় যাবো?

নীলা বলে উঠলো—আজ তোমার খুশিমত আমাকে নিয়ে চলো যেখানে তোমার মনচায়।

বনহুর বললো—আপামনি লেকের ধারে যাবো?

আচ্ছা তাই চলো।

বনহুর গাড়ি চালিয়ে চলেছে।

নীলা নির্নিমেশ নয়নে তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে। তার দু'চোখে বিস্ময়, এতো অল্প সময়ে এতো সুন্দর দক্ষ ড্রাইভারের মত গাড়ি চালিয়ে চলেছে রংলাল এ যেন তার কাছে এক বিস্ময়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নির্জন লেকের ধারে পৌঁছে গেলো তাদের গাড়িখানা।

বনহুর ড্রাইভ আসন থেকে নেমে নীলার পাশের দরজা খুলে ধরলো।

নীলা নেমে পড়লো গাড়ি থেকে।

নীলা যখন গাড়িতে চড়ে বসেছিলো তখন তাকে অত্যন্ত মলিন বিষণ্ন লাগছিলো আর এখন তাকে বেশ প্রফুল্ল মনে হচ্ছিল।

হেসে বললো নীলা—মনির তোমাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে।

একটু হাসলো বনহুর।

নীলা এগিয়ে চললো।

বনহুর ওকে অনুরসণ করলো।

লেকের ধারে এসে দাঁড়ালো নীলা। সুন্দর লেকের পানিতে কতকগুলো ছেলেমেয়ে ছোট ছোট নৌকা নিয়ে খেলা করছিলো।

শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে তাদের অভিভাবকগণও আসেন। বড়রা লেকের ধারে বসে গল্পসল্প করেন আর ছোটরা লেকের মধ্যে নৌকা চেপে খেলা করে।

নীলা একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লো বনহুর দাঁড়িয়েছিলো তখনও।

নীলা বললো—বসো।

বনহুর নীলার কাছ থেকে একটু দূরে বসে পড়লো। তার হাতের মুঠোয় গাড়ির চাবিটা ছিলো। বনহুর গাড়ির চাবিটা নাড়া চাড়া করছিলো।

নীলা কিছুক্ষণ নিশ্চুপ তাকিয়ে দেখলো, ছেলেগুলো তখনও নৌকা চালাচ্ছে। এক সময় বললো—মনির তুমি নৌকা চালাতে পারোনা?

একটু একটু পারি।

চলো না একটা নৌকা নিয়ে লেকের মধ্যে ঘুরে বেড়াই?

বনহুর ওর ইচ্ছায় বাধা দিলোনা, বললো—চলুন।

নীলা বললো—ওদিকে চলো।

কারণ ওদিকে তেমন কোন ছেলে মেয়ে বা লোকজন ছিলোনা? একটা সুন্দর নৌকা ওদিকে তীরে আটকানো ছিলো?

নীলা আগে আগে এগিয়ে চললো।

বনহুর ওর পিছনে।

নৌকায় চেপে বসে ডাকলো নীলা—এসো।

বনহুরও নৌকায় উঠে বসলো, বৈঠা তুলে নিলো সে হাতে। ঝুপ ঝাপ শব্দ তুলে বৈঠা চালাতে শুরু করছে বনহুর।

নীলা ডান হাত দিয়ে পানি নাড়তে লাগলো।

লেকের মাঝ-মাঝি এগিয়ে চলেছে নৌকা খানা।

নীলা বলে—মনির তুমি ভারী সুন্দর নৌকা বাইতে পারো।

ছোট বেলায় খুব নৌকা বাইতাম কিনা।

সত্যি তুমি অপূর্ব......

আপামনি আমি একজন গরিব মুর্খ সাধারণ মানুষ। আপনি কত বড় মহান মহৎ সুশিক্ষিতা...

মনির তুমি নিজকে এতো ছোট ভাবো কেনো বলো তো? তোমার মধ্যে আমি যে অভূতপূর্ব প্রতিভা দেখতে পেয়েছি তা কারো সাধ্য নেই। মনির তুমি এমনি করে চিরদিন আমার পাশে থাকবে কথা দাও?

আপামনি আপনার জন্য কত উচ্চ শিক্ষিত কত ধনবান যুবক প্রতিক্ষা করছে আর আপনি এ সব কি বলছেন?

মনির আমি কিছু চাইনা। শুধু চাই তোমাকে......

স্তব্ধ হয়ে যায় বনহুর। সে জানতো এমনি একটা অবস্থা আসবে তার জন্য প্রস্তুত ছিলো বনহুর তবু কোন জবাব দিতে পারে না সে ঐ মুহূর্তে।

নীলা বনহুরের বুকে মাথা রাখে।

বনহুর তেমনি ভাবে বৈঠা চালিয়ে যায়।

নীলা বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে বলে—কোন কথা বলছো না কোনো মনির?

আপামনি।

না না তুমি আমায় নীলা বলে ডাকবে। বলো নীলা বলে। বলো মনির?

বড় সঙ্কোচ লাগছে আমার আপামনি কি করে আমি আপনার নাম ধরে ডাকবো?

আমি তোমাকে বলছি।

বেশ তাই ডাকবো কিন্তু সবার সামনে আপামনিই বলবো।

তাই ডেকো। মনির আকাশটা বড় সুন্দর লাগছে না?

হাঁ বড় সুন্দর। আপনার নীল দুটি চোখের মত......

মনির তুমি এতো সুন্দর কথা বলতে পারো? তোমার কণ্ঠস্বর এতো সুন্দর......

আপামনি আপনি আমাকে ভালবাসেন তাই আপনার কাছে আমার সব ভাল লাগে।

মনির!

বলুন?

তুমি গান শুনতে ভালবাসো?

বাসি কিন্তু কে আমাকে গান শোনাবে আপামনি?

আবার আপামনি। বলো নীলা?

আচ্ছা বলবো।

গান শুনবে?

শুনবো।

নীলা গান গায়। এতো সুন্দর গলা বনহুর শোনেনি কোনদিন।

অভূতপূর্ব অনুভূতি নিয়ে তাকিয়ে থাকে বনহুর নীলার মুখের দিকে। বনহুর অভিভূত হয়ে যায়।

গান শেষ হয় নীলার।

বনহুর ওর চিবুকটা তুলে ধরে—সত্যি অপূর্ব নীলা তুমি।

মনির! নীলা বনহুরের বুকে মুখ লুকায়।

বনহুর বলে—চলুন এবার আমরা ফিরে যাই?

চলো।

তীরে ফিরে আসে ওরা।

নৌকা তীরে লাগিয়ে বনহুর নেমে দাঁড়ায়।

নীলা নামতে গিয়ে হাত বাড়ায় বনহুরের দিকে।

বনহুর হাত বাড়িয়ে নীলার হাত ধরে ওকে নামিয়ে নেয়। হাসে নীলা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে।

বনহুরও হাসে।

যেমন বনহুর ফিরে দাঁড়িয়েছে অমনি হতভম্ব হয়ে গেলো সে, অদূরে মনির দাঁড়িয়ে আছে তার দু'চোখে বিস্ময় রাগ অভিমান ফুটে উঠেছে।

বনহুর যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

নীলা কিছু বুঝতে না পেরে ডাকে—মনির এসো।

বনহুরের পা দু'খানা যেন মাটির মধ্যে বসে গেছে হাটু অবধি।

মনিরা ততক্ষণে ক্রুদ্ধভাবে অপর দিকে ফিরে চলেছে।

নীলা আবার ডাকে—মনির এসো যাই।

হাঁ চলুন আপামনি। বনহুরের কণ্ঠ যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। হঠাৎ এমন জায়গায় এমন অবস্থায় মনিরাকে দেখবে সে ভাবতে পারিনি।

নীলা বলে—মনির ওকে তুমি চেনো?

হাঁ।

কে সে?

আর একদিন বলবো আজ চলুন আপামনি।

নীলা আর বনহুর গাড়িতে চেপে বসে।

বনহুরই এখন ড্রাইভ আসনে বসে গাড়ি চালাতে শুরু করছে।

নীলা বলে—কথা বলছো না কেনো? হঠাৎ তোমার কি হলো বলো তো?

কিছু না।

নীলা ওর সংক্ষিপ্ত জবাবে খুশি হতে পারে না। সেই মেয়েটিকে দেখার পর হঠাৎ রংলাল যেন সম্পূর্ণভাবে পালটে গেছে। নীলার ভাল লাগেনা যেন।

বাসায় ফিরে বনহুর চলে যায় নিজের কামরার দিকে।

নীলা কোন কথা বলেনা, সে দূর থেকে লক্ষ্য করলো ওকে। সেও চলে গেলো নিজের ঘরে।

❑

মনিরা নূরকে নিয়ে আজ গিয়েছিলো লেকের ধারে। অবশ্য নূরের জেদেই সে গিয়েছিলো, ড্রাইভারকে সঙ্গে করে। নূর যখন তার সঙ্গীদের নিয়ে লেকের মধ্যে নৌকা নিয়ে খেলা করছিলো তখন মনিরা লেকের ধার ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলো দক্ষিণ দিকে।

খানিকটা এগুতেই হঠাৎ চমকে উঠে মনিরা, অদূরে নৌকা থেকে নেমে দাঁড়ালো যেন তারই প্রিয়তম মনির! একটা তরুণী তার দিকে হাত বড়িয়ে দিয়েছে। মনিরা ভাবলো হয়তো তার চোখের ভুল, অন্য কেউ হবে। কিন্তু এগুতেই স্তম্ভিত হলো সে, এ যে তারই স্বামী।

ঠিক ঐ মুহূর্তেই ফিরে দাঁড়িয়েছিলো বনহুর সঙ্গে সঙ্গে মনিরার সাথে দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিলো তার। এমন একটা অবস্থা ঘটে যাবে ভাবতে পারেননি বনহুর। সে নির্বাক হয়ে পড়েছিলো সেই দন্ডে।

মনিরার সমস্ত শরীরে কে যেন আগুন জ্বেলে দিলো। মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠলো। কোনো রকমে সে ছুটে গিয়ে গাড়িতে চেপে বসলো।

ড্রাইভার দূরে দাঁড়িয়েছিলো সে মনিরাকে গাড়িতে এসে বসতে দেখে দ্রুত এগিয়ে এলো—বেগম সাহেবা আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?

মনিরা দু'হাতের মধ্যে মাথা গুজে চুপ করে বসে থাকে কোন কথা বলে না।

ড্রাইভার ব্যস্ত হয়ে পড়ে দ্রুত চলে যায় সে লেকের ধারে যেখানে লেকের মধ্যে নৌকা নিয়ে খেলা করছিলো নূর। ব্যস্ত কণ্ঠে ডাকলো—নূর নূর এসো বেগম সাহেবা বাসায় ফিরে যাবেন।

নূর আর বিলম্ব না করে সাথীদের সঙ্গে করে ফিরে এলো নৌকা নিয়ে তীরে।

নৌকা থেকে লাফিয়ে নেমে এলো নূর—কি হয়েছে ড্রাইভার?

বেগম সাহেবা অসুস্থ বোধ করছেন। চলো নূর।

নূর মায়ের অসুস্থতার কথা শুনে ছুটে এলো গাড়ির পাশে। মাকে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে বসে থাকতে দেখে সে চিন্তিত হয়। ব্যস্ত কণ্ঠে বলে—আম্মি তোমার কি হলো? ও আম্মি কি হলো বলোনা? আম্মি.....

মাথাটা কেমন করছে। ড্রাইভার শীগ্‌গীর বাড়ি চলো। বললো মনিরা।

ড্রাইভার গাড়ি ছাড়লো।

নূর মাকে চেপে ধরে বসে আছে, তার চোখে মুখে একটা ভয়ঙ্কর দুঃচিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। সে ভেবে পাচ্ছে না হঠাৎ তার মায়ের কি হলো।

গাড়ি দরজায় পৌছতেই মনিরা গাড়ি থেকে নেমে ছুটে গেলো নিজের ঘরে নূর এসে মরিয়ম বেগমকে বললো—দাদী আম্মা দেখোগে আম্মির হঠাৎ কি যেন হয়েছে।

নূরের কথায় মরিয়ম বেগমের মনটা আচমকা চমকে উঠলো বললো তিনি—কোথায় তোর আম্মি?

ঘরে! গম্ভীর গলায় বললো নূর।

মরিয়ম বেগম ব্যস্তভাবে এগিয়ে গেলেন মনিরার ঘরের দিকে।

মনির তখন বিছানায় পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মরিয়ম বেগম কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে বিস্মিত হলেন কারণ অসুখ হলে সে অমন করে কাঁদবে কেনো। তিনি এসে বললেন মনিরার শিয়রে, পিঠে হাত রেখে ডাকলেন—মনিরা কি হয়েছে মা? মনিরা ......মনিরা.....

মনিরার কান্নার বেগ আরও বেড়ে গেলো।

মরিয়ম বেগম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি মনিরার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে স্বস্নেহে বললেন—কি হয়েছে মা বলো?

মনির আঁচলে চোখ মুছে সোজা হয়ে বসলো—তার সমস্ত মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে।

নূর স্তব্ধ হয়ে তাকিয়েছিলো মায়ের দিকে, হঠাৎ তার আম্মি এমন হলো কেনো। কি হয়েছে তার ভেবে পাচ্ছে না সে যেন।

মরিয়ম বেগম পুনরায় বলেন—বলো মা? বলো কি হয়েছে তোমার?

নূরকে লক্ষ্য করে গম্ভীর কণ্ঠে বলে মনিরা—নূর তুমি বাইরে যাও।

নূর কিছু বুঝতে না পেরে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়।

মনিরা অশ্রুসিক্ত নয়নে বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলে—মামীমা আমি সব হারিয়ে ফেলেছি। আমি সব হারিয়ে ফেলেছি......

কি বলছো আমি কিছু বুঝতে পারছিনা মা?

তুমি বুঝবেনা মামীমা, তুমি বুঝবেনা। জানো তোমার ছেলে আর আসে না কেনো? সে নতুন এক সঙ্গিনী খুজে নিয়েছে.....কণ্ঠ চাপা কান্নায় ভরে উঠে।

মরিয়ম বেগমের চোখ দুটো ব্যাকুলভাবে মনিরার মুখে ঘুরে বেড়ায় বলেন তিনি কি বলছিস্ মনিরা?

হাঁ মামীমা সব সত্য বলছি। তোমার ছেলে হারিয়ে গেছে আর তাকে খুঁজে পাবো না। আমি কি নিয়ে বাঁচবো বলো বলো মামীমা? মনিরা দু'হাতে মরিয়ম বেগমের গলা জড়িয়ে ধরে।

মরিয়ম বেগম যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। তিনি মনিরাকে প্রকৃতিস্থ করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

মনিরা বেশি কিছু বললো না শুধু যে কেঁদে কেটে অস্থির হলো। খেলোনা সে কিছু, কারও সঙ্গে কথাও বললো না। নূর তো ভেবেই পেলো না হঠাৎ তার আম্মির কি ঘটলো। সমস্ত বাড়িতে একটা নিরানন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হলো।

মনিরা নির্জন ঘরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সমস্ত বালিশ তার অশ্রু জলে ভিজে উঠেছে। তার জীবনের সব সপ্ন যেন ভেংগে চুরমার হয়ে গেছে। কোন দিন আর সে তাকে ফিরে পাবে না।

❑

অনেক রাত।

সমস্ত শহর নিদ্রায় অচেতন।

হঠাৎ পিছন জানালার শার্শী খুলে যায়।

মনিরার ভিতরটা কঠিন হয়ে উঠে; বুঝতে পারে সে এসেছে। তাড়াতাড়ি বালিশে মুখ গুজে চুপ করে থাকে মনিরা। ভারী বুটের শব্দ ভেসে আসে তার কানে! তার বিছানার পাশে এসে থামলো সে।

মনিরা আরষ্ট হয়ে পড়ে আছে, রাগ অভিমান তাকে শক্ত করে তুলেছে। নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

পাশে বসলো সে।

মনিরার বুকটা কেমন যেন টিপ্ টিপ্ করছে। দাঁত দিয়ে অধর চেপে ধরছে সে কঠিন ভাবে।

পিঠে হাত রাখলো বনহুর—মনিরা।

কোন জবাব দিলো না মনিরা, যেমন শুয়েছিলো তেমনি পাথরের মত কঠিন হয়ে পড়ে রইলো।

আবার ডাকলো বনহুর—মনিরা। মনিরা......লক্ষীটি শোন।
এবার মনিরার নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ শোনা গেল। কিন্তু কোন জবাব দিলো না।
বনহুর বললো—মনিরা শোন, তুমি ভুল বুঝনা আমাকে। মনিরা......
এবার মনিরা ঝড়ের বেগে বিছানায় উঠে বসলো—কে তুমি কি চাও এখানে? তোমাকে আমি চিনি না। বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও......
মনিরা স্থির হয়ে শোন। তুমি যা দেখেছো তা ভুল। তুমি যা ভাবছো সত্যি নয়—
না না তুমি যাও! না হলে এখনি নূরকে ডাকবো, তোমার আসল পরিচয় জানিয়ে দিবো তার কাছে। তুমি চলে যাও তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ আছে একথা আমি......
মনিরা আমার একটি কথাও তুমি শুনবে না।
না না চলে যাও বলছি।
বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় নিবিড় করে কিন্তু মনিরা কিছুতেই বনহুরের বাহু বন্ধনে নিজকে ছেড়ে দেয় না। সে কঠিনভাবে নিজকে মুক্ত করে নেয়।
বনহুর বলে, বেশ আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু আমার দুটি কথা তুমি শোন। তুমি যে মেয়েটিকে আমার সঙ্গে দেখেছ, তার সঙ্গে আমার কোন কুৎসিত সম্বন্ধ নেই। আর আমি যতটুকু করছি বা ওর সঙ্গে মিশছি তা আমার স্বার্থ নিয়ে, কারণ তুমি শুনে রাখো মনিরা ঐ মেয়েটির বাবা কান্দাই হত্যা রহস্যের সঙ্গে জড়িত আছে। আমি সেই হত্যা রহস্যের মূল শিকড় উপড়ে ফেলতে চাই। আজ আমি যাচ্ছি, যেদিন তোমার মন থেকে সন্দেহের ছায়া মুছে যাবে সে দিন আমি আসবো। বনহুর কথা গুলো বলে উঠে দাঁড়ালো, পা বাড়ালো সে, যে পথে এসেছিলে সেই পথে বেরিয়ে যাবার জন্য।
মনিরার সব অভিমান মুছে গেলে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো —দাঁড়াও।
বনহুর দাঁড়িয়ে পড়লো।
মনিরা বললো—শোন।
বনহুর এগিয়ে এলো মনিরার পাশে।
মনিরা এবার বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে বললো—তুমি যেতে পারবে না।
সে কি তুমি তো আমাকে চলে যেতে বললে।
না আমি তোমাকে যেতে দেবো না।
মনিরা!
হাঁ!
এবার বনহুর বসে পড়লো খাটের পাশে।

মনিরা ওর জামার আস্তিন চেপে ধরে বললো—ও তোমার নাম ধরে ডাকলে, আমি নিজের কানে শুনেছি। বলো ও তোমার নাম জানলো কি করে।

বনহুর হাসলো—সে এক অদ্ভুত কাহিনী, বললে তুমি বিশ্বাস করবে না। ঐ মেয়েটির নাম নীলা। ওদের বাগানে আমি মালির কাজ করতাম রংলাল ছিলো আমার নাম উদ্দেশ্য তোমাকে আগেই বলেছি। থামলো বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটি সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো।

মনিরার মুখমণ্ডল তখনও প্রসন্ন হয়নি সে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছে স্বামীর মুখে।

ডিম লাইটের স্বল্প আলোতে বনহুরকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছিলো মনিরা মুখে ক্রুদ্ধভাব টেনে রাখলেও মনে মনে সে স্বামীকে নিবিড় করে পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠছিলো।

বনহুর কয়েক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে—নীলাই আমার রংলাল নাম পাল্টে ঐ নাম দিয়েছে। আমি অবশ্য আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম নীলার দেওয়া নতুন নামটা শুনে।

তা বুঝলাম কিন্তু ওর সঙ্গে তোমার এতো গভীরতা হলো কি করে।

আমার নয় নীলাই আমাকে......

বুঝেছি কিন্তু কতদিন চলবে তোমার এই অভিনয়।

হেসে বললো বনহুর—যতদিন কার্যোদ্ধার না হবে। মনিরা তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না?

করি!

কিন্তু মাঝে মাঝে বিশ্বাস হারিয়ে ফেল এইতো? লক্ষীটি তুমি আমাকে অবিশ্বাস করো না। নিজকে সংযত রাখার মত সমর্থ তোমার স্বামীর আছে। বনহুর মনিরাকে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করে।

এবার মনিরা স্বামীর বাহু বন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত করে নেয় না।

সমস্ত রাত ওরা নানা গল্পে কাটিয়ে দেয়। একটু ঘামায় না ওরা দু'জন।

ভোর হবার কিছু পূর্বে বনহুর মনিরার কাছে বিদায় নিয়ে চলে যায়।

নীলাও সমস্ত রাত ঘুমাতে পারেনি তার মনেও আজ অভূতপূর্ব আনন্দ। রংলাল সুন্দর গাড়ি চালানো শিখেছে। সুন্দরভাবে কথা বলতে শিখেছে। ওর কণ্ঠস্বর তার মনকে অভিভূত করে ফেলেছে।

ভোর হতে না হতেই নীলা তার সালটা গায়ে জড়িয়ে রংলালের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো। রোজ খুব ভোরে ঘুম ভাংগে ওর, আজ এতো বেলা ঘুমাচ্ছে। নীলা আলগোছে প্রবেশ করে।

রংলাল তার বিছানায় অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

নীলা এসে দাঁড়ালো ওর বিছানার পাশে। ডাকলো সে—মনির মনির......

বনহুর ভোর রাতে শুয়েছে তাই আজ ওর ঘুমটা বেশি জমে উঠেছে। নীলার ডাক ওর কানে পৌঁছায় না।

নীলা ওর গায়ে হাত রেখে ডাকে—মনির......মনির রংলাল......

ও বিরক্ত করো না মনিরা একটু ঘুমাতে দাও।

মনিরা! কে মনির? হাসে নীলা তারপর ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গিয়ে বাগান থেকে একটা সুন্দর গোলাপ তুলে ফিরে আসে রংলালের ঘরে।

ফুলটা ওর বালিশের পাশে রেখে বেরিয়ে যায় নীলা।

অনেক বেলায় আজ ঘুম ভাংগে বনহুরের। বিছানায় উঠে বসতেই নজরে পড়ে নীলার রেখে যাওয়া ফুলটা। ফুলটা হাতে তুলে নিয়ে মৃদু হাসে বনহুর। বুঝতে পারে নীলা এসেছিলো তার ঘরে।

❑

আব্বু ক'দিন হলো লক্ষ্য করছি তুমি সব সময় কি যেন ভাব। কেমন যেন শুকনো মনে হচ্ছে তোমাকে। বলোতো কি হয়েছে তোমার? চায়ের টেবিলে বসে প্রশ্ন করলো নীলা—খান বাহাদুর আমির আলীকে।

রংলাল পরিবেশন করছিলো।

নীলার কথাগুলো শুনে তাকালো সে আমির আলীর মুখে।

আমির আলী কন্যার প্রশ্নে প্রথম একটু হক চকিয়ে গেলেন তারপর নিজকে সংযত করে নিয়ে বললেন ক'দিন থেকে শরীরটা বড় ভাল যাচ্ছে না মা।

ডাক্তার দেখাও না কেনো আব্বু?

শুধু শরীর খারাপ নয় এর সঙ্গে কাজের চাপও বেড়ে গেছে তাই......

আব্বু তোমাকে বলেছিলাম রংলালকে তুমি তোমার গবেষণাগারে নিতে পারো। ও তোমাকে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

আমির আলী সাহেব বললেন—আমিও তাই ভাবছি। রংলাল বেশ কজের ছেলে ওকে আমি আমার গবেষণাগারেই নেবো। তবে একটু লেখাপড়া জানা দরকার এই যা অসুবিধা।

আব্বু তোমার কোনকিছু ভাবতে হবে না। ওকে আমি লেখাপড়া অনেকটা শিখিয়ে নিয়েছি। আর একটা কথা তুমি শুনলে খুশি হবে।

বলো মা?
রংলাল সুন্দর গাড়ি চালাতে শিখেছে।
তাই নাকি? কবে ওকে গাড়ি চালানো শেখালি নীলা?
রোজ বিকেলে ।
বাঃ বাঃ ভালই হয়েছে।
আব্বু তুমি ওকে তোমার গবেষণাগারে কাজ দিও।
আচ্ছা মা তাই দেবো।
আব্বু এ মাসে রংলালের মাইনেটা কিছু বাড়িয়ে দিও কিন্তু। বাড়িতে বুড়ো মা আছে তার জন্য কিছু টাকা আর জিনিসপত্র পাঠাবে।
আমীর আলী সাহেব বললেন—আচ্ছা দেবো। হ্যাঁ মা একটা কথা আগামী অমাবস্যায় আমাকে আবার ফিরু ডাকবাংলায় যেতে হচ্ছে।
তোমার কাজ বুঝি শেষ হয়নি আব্বু?
না মা হয়নি।
আব্বু রংলাল আমদের সঙ্গে যাবে না?
যেতে চায় যাবে। কি রংলাল তুমি যাবে নাকি তোমার চাচা চাচীকে দেখতে?
হাঁ মালিক আমি যাবো। তাছাড়া মা আছে তাকেও দেখে আসবো। কথাগুলো বললো রংলাল।
নীলার দু'চোখে আনন্দ ঝরে পড়ে।
আবার ফিরু গাঁও-এ যাবে নীলা এবার তাদের সঙ্গে থাকবে রংলাল। সেবার নীলা কোথাও বেড়াতে বের হয়নি। এবার সে বেড়াবে। রংলাল গাড়ি চালানো শিখেছে কাজেই কোন অসুবিধা হবেনা। ওকে সঙ্গে করে যেখানে মন চাইবে সেখানেই যাবে সে।
বৈকালে নীলা আলগোছে এসে দাঁড়ালো রংলাল এর কক্ষে কিন্তু রংলাল কোথায়। হঠাৎ তার নজর পড়লো বাগানের মধ্যে ফোয়ারার ধারে চুপচাপ বসে আছে রংলাল।
নীলা পিছন থেকে ওর কোলে একটা ফুল ছুড়ে দেয়।
চমকে ফিরে তাকায় বনহুর।
নীলাকে দেখে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—আপামনি!
না আপামনি নয়—বলো নীলা।
হু হু আপনার নাম আমি ধরতে পারবো না।
সত্যি বলছো?
আপনি যে মালিকের মেয়ে।
তাতে কি। আচ্ছা রংলাল?

বলুন?
আগামী অমাবস্যায় আমরা ফিরু গাঁও যাবো।
হাঁ। হঠাৎ বনহুর গম্ভীর হয়ে পড়লো।
নীলা ওর মুখভাব লক্ষ্য করে বললো—কি হলো তোমার মনির?
কিছু না।
নিশ্চয়ই তোমার কিছু হয়েছে।
প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য বললো বনহুর—চলুন আপামনি বাইরে যাই।
চলো মনির। জানো আজ কোথায় যাবো আমরা?
আমি জানবো কেমন করে?
আজ যাবো অনেক দূর যেখানে কেউ থাকবে না। শুধু তুমি আর আমি...
আপামনি সন্ধ্যা হতে বেশি দেরী নাই তাই বলছিলাম...
কোন কথা শুনতে চাইনা মনির—চলো গাড়ির পাশ চলো।
বনহুর নীলার পিছনে পিছনে অনুসরণ করে।
আজ নীলা গাড়ির ড্রাইভিং আসনে বসে বলে—এসো।
বনহুর সুবোধ বালকের মত তার আদেশ পালন করলো।
শহর ছেড়ে অনেক দূর এলো নীলা।
সুন্দর একটি বনভূমি।
গাড়ি রেখে নেমে পড়লো নীলা। আজ নীলা ওর হাত ধরে নিয়ে চললো, বললো যে মনির এমন নির্জন জায়গা বেছে নিয়েছি, এখানে শুধু আমরা দু'জনা কেউ আজ আমদের মিলনে বাধা দিতে পারবে না।
বনহুর বললো—আপামনি...
না আপামনি নয় বলো নীলা।
বেশ তাই হলো—নীলা আজ আমি একট স্বপ্ন দেখেছি তোমাকে বলবো বলবো করে বলা হয়নি।
স্বপ্ন!
হাঁ।
চলো ওখানে বসি গিয়ে।
একটা উঁচু জায়গায় পাশাপাশি বসে নীলা আর বনহুর।
বলে নীলা—এবার তোমার স্বপ্ন কাহিনী বলো শুনি?
বনহুর মুখোভাব গম্ভীর করে বললো—স্বপ্ন দেখলাম তুমি আর আমি একটা সুন্দর বাগানে বসে আছি। ফুল দিয়ে আমাদের দু'জনার সমস্ত শরীর সুসজ্জিত। ফুলে ফুলে তুমি ফুলরাণী সেজেছো আর আমি আমার শরীরেও ফুলের পোশাক।
তারপর?

তুমি গান গাইছো আমি তোমার মুখে তাকিয়ে আছি। তুমি হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরতে যাচ্ছো...ঠিক ঐ মুহূর্তে একটি জমকালো পোশাক পরা লোক...

বলো বলো থামলে কেনো? তারপর......

জমকালো পোশাক পরা লোকটা তার পোশাকের মধ্যে থেকে একটি সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা বের করে বসিয়ে দিলো আমার বুকে......

চুপ করো! চুপ করো মনির আমি আর শুনতে চাইনা। কি জানি আমার ভয় হচ্ছে। জানো সেই জমকালো পোশাক পরা লোকটা কে? সেই তো দস্যু বনহুর। যে আমার কাছ থেকে তোমায় ছিনিয়ে নিতে চায়। না না আর এখানে বিলম্ব করবোনা মনির। চালো ফিরে যাই।

আমার স্বপ্নের শেষটুকু শুনবেনা—নীলা?

না আমি আর শুনতে চাইনা। চলো মনির ফিরে চলো।

বনহুর বললো—সন্ধ্যার একটু বাকি আছে। আর বসবেনা?

না চলো। নীলা উঠে পড়ে।

বনহুর হাসলো, সে এ জন্যই স্বপ্ন কাহিনী বলেছিলো। নীলার সরল মন ভয়ে দুঃখ ভাবনায় মুষড়ে পড়ে। চারিদিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় নীলা।

ফিরে আসে ওরা গাড়ির পাশে।

নীলাকে লক্ষ্য করে বলে বনহুর—নীলা তুমি বসো আমি ড্রাইভ করছি।

তাই চলো মনির। বড্ড ভয় করছে যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয়। যদি সে এসে পড়ে।

মরতে ভয় তোমাকে নিয়ে।

মনির!

হাঁ কারণ দস্যু বনহুর আমাকে হত্যা করে তোমাকে নিজের করে নিতে চায়।

কোনদিন তা হবেনা। আমি শুধু তোমাকে চাই।

নীলা দস্যু বনহুর যা বলে তা সে করে। তুমি তো বলেছো দস্যু বনহুরের অসাধ্য কিছু নাই।

না না ও সব কোন কথা আজ এ মুহূর্তে আমি শুনতে চাইনা। তুমি গাড়ি ছাড়ো......

বনহুর এবার গাড়ি ছাড়লো।

গাড়িখানা নির্জন পথ ছেড়ে শহরের পথে এসে পড়লো জনমুখর রাজ পথ।

নীলা আশ্চর্য হয়ে দেখছে রংলাল সুন্দরভাবে গাড়ি চালিয়ে চলেছে। এতো জনতার ভিড়েও সে দক্ষ ড্রাইভারের মত গাড়ি চালাচ্ছে।

নীলা অভিভূত বিস্মিত হতবাক হয়ে গেছে যেন।

একদিন হঠাৎ নীলা রংলালের কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পায় সে মনোযোগ সহকারে কি যেন লিখছে।

নীলা পা টিপে টিপে রংলালের পিছনে এসে দাঁড়ালো, উঁকি দিলো তার কাঁধের উপর দিয়ে সম্মুখে। নীলা হাতের নিচে কাগজ খানায় লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেলো। রংলাল ইংরেজিতে চিঠি লিখছে।

নীলা যেন পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে যায়। তার গলা দিয়ে কোন কথা বের হয়না। সে যেমন অতি সন্তর্পণে এসেছিলো তেমনি বেরিয়ে যাচ্ছিলো।

বর্নহুর নীলার উপস্থিতি বুঝতে পেরেছিলো। সে চিঠিখানা ভাঁজ করে রাখতে রাখতে ডাকলো—নীলা।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েলো নীলা, বিস্ময় নিয়ে অবাক চোখে তাকালো সে রংলালের মুখের দিকে। আজ নীলা ঐ দুটি চোখ অদ্ভুত এক দৃষ্টি দেখতে পায়! সে চাহনি যেন রংলালের নয়।

নীলা সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারে না।

বনহুর তার শয্যায় বসে বসে চিঠিখানা লিখছিলো, এবার সে উঠে এল নীলার পাশে।

নীলা তখনও স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে ওর চোখ দুটির দিকে।

বনহুর ঠিক নীলার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো। হেসে বললো—খুব আশ্চর্য হয়ে গেছো নীলা! অসময়ে তুমি আসবে জানলে সাবধান হতাম।

ধীরে ধীরে নীলার মুখমণ্ডল গম্ভীর হলো, এবার কঠিন কণ্ঠে বললো—বলুন আপনি কে? কি আপনার পরিচয়? নিশ্চয়ই আপনি সাধারণ রংলাল নন।

হঠাৎ বনহুর হেসে উঠলো।

নীলা আরও অবাক হয়ে গেছে ওকে যত দেখছে ততই যে হতবাক বিস্মিত হচ্ছে। এমন করে সে তো কাউকে হাসতে দেখেনি অদ্ভুত এ হাসি।

বনহুর হাসি থামিয়ে বলে—মিস নীলা আজ আপনাকে কয়েকটি কথা বলবো।

না আমি আপনার কোন কথা শুনতে চাইনা। বলুন আপনি কে?

আমার পরিচয় জানাতে কোন আপত্তি নেই তবে এখনও সম্পূর্ণ সময় আসেনি। হাঁ প্রথমে একটি কথা আপনাকে বলে রাখি কারণ আমি যেই হইনা কেনো আপনার অমঙ্গল আমার চিন্তা নয় মনে রাখবেন।

আমার মঙ্গল চান কি অমঙ্গল চান আমি জানতে চাই না। জানতে চাই মিথ্যা রংলালের অভিনয় করে আমাকে আপনি......

সেজন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী মিস নীলা।

বলুন কে আপনি?

আমি আমার পরিচয় এখন দিতে পারছিনা তবে বিশ্বাস করুন আমি কে এ কথা আপনাকে জানাবো। শুধু আগামী অমাবস্যা পর্যন্ত আমাকে আপনি কোন প্রশ্ন করবেন না। এই আমার অনুরোধ। বনহুর কথাগুলো বলে ফিরে এলো নিজের বিছানায়। বালিশের তলা হতে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেট ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে তাতে অগ্নি সংযোগ করে বলে—মিস নীলা জানি আপনি আমার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন কিন্তু আমি যা করেছি। সব আমার মনের এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

নীলার দৃষ্টি তখনও বনহুরের দিকে নিবদ্ধ ছিলো। এতোদিন সে রংলালকে অশিক্ষিত একটি সাধারণ লোক মনে করে তার সঙ্গে কি ব্যবহার করেছে, কি ভাবে লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করেছে, কত বকেছে, সব কথা তার মনে উদয় হতে লাগলো। গাড়ি চালানো ব্যাপার খানাও এখন তার কাছে খোলাসা হয়ে গেছে। সামান্য ক'দিনেই রংলাল এমন দক্ষ ড্রাইভারের মত গাড়ি চালানো শিখলো কি করে ভেবে বাক হয়েছিলো নীলা। এখন সব পরিষ্কার হয়ে যায়। রংলাল শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত যুবক, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

বনহুর এগিয়ে এলো নীলার পাশে—আমাকে ক্ষমা করতে পারছেন না, তাইনা? সত্যি আমি অপরাধী মিস নীলা। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বনহুর। একটু থেমে বলে—বেশ তা হলে আমি চলে যাবো। আপনাকে আর বিরক্ত করবোনা। কিন্তু মনে রাখবেন, আমি কর্তব্যের খাতিরে আপনাদের বিরক্ত করেছি....

বনহুর তার জামা কাপড়গুলো গোছাতে শুরু করে।

নীলা ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসে—কোথায় যাবেন আপনি?

আমার কাজে।

কাজ। কিসের কাজ আপনার?

যে কাজের জন্য আপনাদের এখানে রংলালের বেশে ছিলাম।

কাজ কি আপনার শেষ হয়েছে?

না।

তবে কেনো যাবেন আপনি?

আপনাদের কাছে আমি অপরাধী। মানে আপনার কাছে...

না আপনি অপরাধী নন। অপরাধী আমি! না জেনে অনেক সময় আপনাকে আমি অনেক কিছু বলেছি....সেজন্য আমি লজ্জিত, দুঃখিত।

মিস নীলা! আপনি কোন ভুল করেননি। দোষতো সব আমার। একটি কথা আপনাকে আজ জানিয়ে রাখি, খান বাহাদুর আমির আলী সাহেব আপনার পিতা নন...

মিথ্যা কথা। কঠিন কণ্ঠে বললো নীলা।

না মিস নীলা মিথ্যা নয়। তবে তিনি আপনাকে নিজ কন্যার মতই ভালবাসেন, স্নেহ করেন একথাও মিথ্যা নয়।

দু'চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকে নীলা বনহুরের দিকে। আজ কি সে সব কিছু দুঃস্বপ্ন দেখছে। রংলাল আজ তার কাছে পর হয়ে গেলো। তার বাবা তার আপনজন নন, এ সব কি শুনছে সে।

নীলা ধৈর্য হারিয়ে ফেলে চিৎকার করে উঠে—না না, আমি একথা বিশ্বাস করিনা।

বনহুর তার বলিষ্ঠ হাতে নীলার মুখ চেপে ধরে—চিৎকার করবেন না। সব কিছুর প্রমাণ আপনি পাবেন মিস নীলা। কিন্তু আগামী অমাবস্যা পর্যন্ত আপনাকে অসীম ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে হবে।

আজ যেন নতুন করেই বনহুরের ছোয়া নীলার শরীরে শিহরণ জাগায়। নতুন এক অনুভূতি নাড়া দেয় তার হৃদয়ে। নীলা ছুটে বেরিয়ে যায় সেই কক্ষ থেকে।

সমস্ত দিন নীলা আর বনহুরের সম্মুখে আসে না। একটা লজ্জাতুর ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। রংলালের সঙ্গে তার দিনগুলি স্মৃতি আজ সে মন্থন করে চলে। প্রথম দিনের কথা আজও ভোলেনি নীলা। একটি ফুলের আশায় সে বাগানে গিয়েছিলো, এই মালি ঐ ফুলটা দাও তো।

ফিরে তাকিয়েছিলো রংলাল।

নীলা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলো রংলালকে দেখে। পৌরুষ দীপ্ত বলিষ্ঠ চেহারা? রক্তিম গণ্ড, প্রশস্ত ললাটে মুক্তা বিন্দুর মত ফোটা ফোটা ঘাম।

সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারেনি সে কিছুক্ষণ।

রংলাল নীলার এ দুর্বলতা বুঝতে পেরেছিলো। তাড়াতাড়ি সে একটি গোলাপ গাছ থেকে ছিড়ে নিয়ে বাড়িয়ে ধরেছিলো—নিন।

নীলা তারপর অভিভূত হয়ে গিয়েছিলো। রংলালকে সে যেমন করে হোক সভ্য সমাজে তুলে ধরবে। তাকে যে মনের মত করে গড়ে নেবে। নীলার মনে সব কথা ভেসে উঠে একটির পর একটি করে।

নীলা রংলালকে অনেকদিন নিবিড় করে পেয়েছে। ওর বুকে মাথা রেখেছে কিন্তু আশ্চর্য, রংলাল তো কোন সময় ওকে নিবিড় করে কাছে টেনে নেয়নি। তখন হয়তে নীলা ভেবেছে এটা রংলালের দুর্বলতা কারণ সে আরও

অনেক তফাৎ। সে মালিকের কন্যা আর রংলাল যত সুন্দর বলিষ্ঠ পুরুষই হোক, সে চাকর।

আজ রংলালকে নতুন করে আবিষ্কার করেছে নীলা। প্রথমে সঙ্কোচ দ্বিধা জন্মালেও পরে সে অন্তরে অন্তরে আনন্দ বোধ করতে লাগলো। ওর আসল পরিচয় নিশ্চয়ই অনেক বড়। অনেক শিক্ষিত তাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ ওর লেখাগুলিই তার প্রমাণ।

কি লিখছিলো সে আর কার কাছেই বা লিখছিলো। কে এই রংলাল যার পরিচয় সে এখনও জানে না। নীলা সবচেয়ে বেশি চিন্তিত হয়েছে খান বাহাদুর আমির আলী তার পিতা নয় এ কথা সে বিশ্বাস করতে পারছেনা। ওর মনে হচ্ছে এক্ষুণি ছুটে গিয়ে তার আব্বুকে কথাটা জিজ্ঞাসা করে...আব্বু! আমি তোমার মেয়ে নই...কিন্তু সে তাকে বার বার নিষেধ করেছে, মিস নীলা। আগামী অমাবস্যা পর্যন্ত আপনকে ধৈর্য ধরতে হবে। তবে কি কোন গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে তার জীবন কহিনীর সঙ্গে। কে তার সত্যিকারের পিতা আর আমির আলীই বা কে। কি করে সে এলো তার কাছে।

নীলা ছটফট করে। একবার মনে করে সব কথা যে খান বাহাদুর সাহেবকে বলে দেবে, কিন্তু ওর কথা মনে হয়। দীপ্ত বলিষ্ঠ সেই কণ্ঠ —অসীম ধৈর্য ধরুন মিস নীলা....

হাঁ সে ধৈর্যই ধরবে। আগামী অমাবস্যা পর্যন্ত সে প্রতিক্ষা করবে কোন এক রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য। আরও একটা কথা নীলার আজ বেশি করে মনে হচ্ছে। আজ ক'দিন থেকে খাঁ বাহাদুর আমির আলীকে সে অত্যন্ত ভিষণ্ন মলিন দেখছে। সব সময় তিনি তার গবেষণাগারে কি যেন করেন তিনিই জানেন।

নীলার চারিদিকে যেন একটা রহস্য জাল ছড়িয়ে পড়ে সে যেন ক্রমেই সেই রহস্য জালে জড়িয়ে পড়ছে।

পদশব্দে চমকে উঠে নীলা। চোখ তুলতেই অবাক হয় সে। রংলাল চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে—আপামনি আপনার চা।

নীলার চোখে মুখে বিস্ময় ঝরে পড়েছে।

ওকে স্বাভাবিক করবার জন্যই বনহুর এসেছে এ মুহূর্তে চায়ের কাপ নিয়ে। পূর্বের মতই হেসে বলে—আজ বেড়াতে যাবেন না আপামনি?

নীলা ওর হাত থেকে চায়ের কাপ তুলে নেয়। তারপর বলে—যাবো।

খুশি হয়ে বেরিয়ে যায় বনহুর।

গাড়ি পরিষ্কার করছিলো বনহুর, নীলা এসে দাঁড়ায় তার পাশে —কই হলো?

বনহুর ব্যস্ত কণ্ঠে বললো—হাঁ হয়েছে! নীলার দিকে দৃষ্টি পড়তেই অবাক হলো বড় ভার লাগছে আজ নীলাকে। সুন্দর করে সেজেছে নীলা আজ।

বনহুর হঠাৎ বলে উঠলো—অপূর্ব!

নীলা যেন লজ্জায় সঙ্কোচিত হয়ে উঠলো। রাঙা হয়ে উঠলে ওর গণ্ডদ্বয়।

বনহুর বললো—ড্রাইভ আসনে না পাশে।

নীলা কোন কথা না বলে ড্রাইভ আসনের পাশে উঠে বসলো।

বনহুর এবর ড্রাইভ্ আসনে বসলো।

গাড়িখানা বেরিয়ে এলো খান বাহাদুর আমির আলীর গাড়ি বারান্দা থেকে।

গাড়ি জনমুখর রাজ পথ বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

বললো বনহুর—আজ কোথায় আদেশ করুন?

নীলার মুখে দুষ্টোমির হাসি ফুটে উঠলো। বললো—যেখানে আপনার খুশি।

উহুঁ! আপনি নয় তুমি।

না।

কেনো?

এখন আপনাকে কি বলে ডাকবো বলুন।

কেনো আপনি যা বলে ডাকতেন।

মনির!

হাঁ, ঐ নামেই ডাকবেন!

না,. ডাকবেন নয়, ডেকো।

বেশ তাই হবে বনহুর খুশি হলো। সে চেয়েছিলো পরিবেশটা স্বাভাবিক করে আনতে। নীলার কাছে সহজ হওয়াটাই তার দরকার। কারণ এখনও বেশ কয়েকটা দিন তাকে এখানে কাটাতে হবে।

কিছুক্ষণ তাদের নীরবে কাটে।

নীলা বলে উঠে—ভারি সুন্দর গাড়ি চালাতে পারো। শুধু আমাকে হয়রানি করেছো।

হাসে বনহুর।

নীলা এবার মুখোভাব গম্ভীর করে বলে—আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারছো না তাই আমার কাছেও তোমার পরিচয় গোপন রেখেছে? বলো বন্ধু, বলো, কে তুমি?

আজ নয় নীলা।

উহুঁ তোমাকে বলতে হবে।

যদি বিদায় দাও তাহলে আমার পরিচয় তোমাকে জানাতে রাজি আছি।

বিদায়! চলে যাবে তুমি?

যদি না ছাড়ো, যদি আমার পরিচয় তোমাকে জানাতে হয় তা হলে বিদায় নিতে হবে বৈকী। চলো নীলা আজ নতুন এক জায়গায় তোমাকে নিয়ে যাবো।

নতুন জায়গা?

হ্যাঁ।

কোথায়?

মজুরদের বস্তিতে।

মজুরদের বস্তি নতুন জায়গা?

আমার কাছে নয় তোমার কাছে নীলা! কারণ তুমি কোনদিন এদের মধ্যে আসোনি কিনা।

বেশ চলো।

গাড়ি আরও কিছুক্ষণ চলার পর একটা নোংরা বস্তির পাশে এসে থামলো।

গাড়ির দরজা খুলে ধরলো বনহুর—নেমে এসো।

নীলা নেমে দাঁড়ালো।

ততক্ষণে দূর থেকে বস্তির লোকজন বনহুরকে দেখে ফেলেছিলো তারা উঠি পড়ে করে ছুটে আসে। বনহুরকে তো তারাও জানে না, জানে এই লোকটা তাদের মুখে খাবার তুলে দেয়। পরনে বস্ত্র এনে দেয়। অসুখে ঔষধ যোগায়।

ছুটে এলো উলঙ্গ অর্ধ উলঙ্গ জীর্ণ কঙ্কাল সার লোকগুলো। ঘিরে দাঁড়ালো বনহুরকে সবাই। ছালাম জানাতে লাগলো শ্রদ্ধাভরে।

বনহুর পকেট থেকে এক গাদা টাকা বের করে সবাইকে দিতে শুরু করলো।

নীলার দু'চোখে বিস্ময়। যাকে তার আব্বু মাসে দু'শো টাকা মাইনে দেয় আর সেই কিনা হাজার হাজার টাকা বিলিয়ে দিচ্ছে অকাতরে দীন হীন বস্তির অসহায় লোকগুলির মধ্যে।

অগণিত দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ওকে যেন দেব পুরুষ বলে মনে হচ্ছিলো।

একটা বৃদ্ধা এগিয়ে এলো।

বনহুর তাকে ডাকলো—মা এই নাও তোমার টাকা।

বৃদ্ধার মুখে হাসি ফুটলো। টাকা হাতে নিয়ে তার আনন্দ।

বনহুর নীলাকে লক্ষ্য করে বললো—নীলা তুমি আমার মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে। এইতো এরাই আমার মা বাবা ভাইবোন।

নীলার দু'চোখে বিস্ময়। সে যেন স্তম্ভিত, হতবাক হয়ে গেছে।

একজন বৃদ্ধ এসে বললো—বাবা আমার ছেলেটার খুব অসুখ। সে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না। তুমি এসেছো শুনে কাঁদছে। তোমাকে এক নজর দেখতে চায়......

বনহুর নীলাকে লক্ষ্য করে বলে—তুমি গাড়িতে গিয়ে বসো আমি আসছি।

আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

দুর্গন্ধময় অন্ধকার ঘরে ঢুকতে পারবে না নীলা।

তুমি যদি পারো, আমিও পারবো চলো।

বেশ চলো।

বনহুর আর নীলা পাশাপাশি এগিয়ে চলে।

সেই বৃদ্ধা এগোয় আগে আগে।

যখন বনহুর নীলা বস্তির মধ্য দিয়ে এগুচ্ছিলো তখন অগণিত ছেলে মেয়ে আর বস্তির মানুষ তাকে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছিলো।

বনহুর আর নীলা সেই বৃদ্ধার কুঁড়ে ঘরে প্রবেশ করলো। আধো অন্ধকার দুর্গন্ধময় অপরিচ্ছন্ন জায়গা। একটা তেলচিটে বিছানায় শুয়ে আছে একটি বালক।

বনহুর কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করলো।

পিছনে নীলা।

বালকটি বনহুরকে দেখা মাত্র রোগ শয্যায় উঠে বসে আনন্দ উচ্ছল কণ্ঠে বললো—ভাইয়া আপনি এসেছেন। আমার বড্ড খুশি লাগছে। কতদিন আপনি আসেন নাই...

বনহুর এগিয়ে গিয়ে ওর বিছানায় বসে পড়লো, ওকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললো—ভাই এই তো এসেছি। তোমার অসুখ...

ভাইয়া! এবার আমার অসুখ সেরে যাবে।

আচ্ছা আবার এসে দেখে যাবো তোমাকে।

আসবেন ভাইয়া।

নিশ্চয় আসবো। বনহুর পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে অসুস্থ বালকের বৃদ্ধ মাতার হাতে দিয়ে বললো— ওর ভালভাবে চিকিৎসা করবে।

বনহুর আর নীলা ফিরে এলো গাড়ির পাশে। নীলাকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর— দেখলে নীলা, এরাও মানুষ। আর তোমরাও মানুষ কিন্তু.....

বলো, থামলে কেনো?

থাক এখন নয়, চলো গাড়িতে বসে বলবো।

বনহুর গাড়ির দরজা খুলে ধরে, উঠো।

নীলা চেপে বসে।

বনহুর ড্রাইভ আসনে বসলো।
গাড়ির চার পাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে অসংখ্য দুঃস্থ মানুষ। সবাই হাত নেড়ে বনহুরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে।
বনহুর হাত নাড়লো।
গাড়িখানা স্পীডে এগিয়ে চলেছে।
বনহুর গাড়ি ছাড়বার পূর্বে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে নিয়েছিলো। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো— কিন্তু তোমরা আর ওরা কত তফাৎ! নীলা!
বলো!
ঠিক একটা নতুন জায়গা দেখলে আজ তাই না?
নীলা নীরব। কারণ সে সত্যি কোনদিন এমন নিকৃষ্ট বস্তিতে আসেনি। আসার কোন প্রয়োজনও মনে করেনি কোনদিন!
বললো বনহুর— নীলা জানি এদের তোমরা ঘৃণা করো, কিন্তু জানো, এরা না হলে সভ্য সমাজ বলে এ দুনিয়ায় কিছু থাকতো না। এরাই সভ্য সমাজের মেরুদণ্ড।
আমি তাই এদের বাঁচিয়ে রাখতে চাই নীলা।
সত্যি তোমার তুলনা হয়না মনির। তোমাকে যত দেখছি ততই বিস্মিত হচ্ছি। নীলা বনহুরের কাঁধে মাথা রাখে। ওগো! অজানার বন্ধু! তুমি কে বলো?
নীলা! আমি তোমারই মত একজন মানুষ।
তবু?
আজ নয় নীলা।
মনির! একটা কথা আমাকে বড় অস্থির করে তুলেছে। আমার আব্বু আমার কেউ নন, একথা কি সত্য?
অবিশ্বাসের কিছু নেই। কারণ, তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।
মনির আমি যেন ক্রমেই রহস্য জালে জড়িয়ে পড়ছি।
ভয় নেই নীলা! আমি তো তোমার পাশে আছি।
সত্যি! সত্যি বলছো মনির?
যতদিন তুমি অভিশাপ মুক্ত না হও ততদিন আমি তোমার পাশে থাকবো।
মনির।
হ্যাঁ, নীলা! তোমার সম্মুখে একটা কঠিন বিপদ এগিয়ে আসছে।
আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।
সব জানতে পারবে নীলা।

কিন্তু আমি যে ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়ছি।

বলেছি, যতক্ষণ তুমি বিপদ মুক্ত না হবে ততক্ষণ আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না নীলা।

বিপদ কেটে গেলেই তুমি চলে যাবে?

গাড়ির সম্মুখে দৃষ্টি রেখে বললো বনহুর তখন আমার প্রয়োজন আর হবে না তাই চলে যাবো।

না না, আমি কোনদিন তোমাকে যেতে দেবো না। তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না মনির!

নীলা!

মনির তাহলে আমি চাই না অভিশাপ মুক্ত হতে! চাই না বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে........ বিপদ মুক্ত হলে তুমি থাকবে না। এ আমি ভাবতেও পারি না......... কান্নায় ভেংগে পড়ে নীলা।

বনহুরের মনে নীলার চোখের পানি আলোড়ন সৃষ্টি করে। সে কোন জবাব দিতে পারে না।

বাড়ির ফটকে গাড়ি প্রবেশ করে।

নীলা আঁচলে চোখের পানি মুছে ফেলে।

গাড়ি বারান্দায় গাড়ি থামতেই বনহুর নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরে।

নীলা নেমে আসে গাড়ি থেকে। বনহুরের দিকে এক নজর তাকিয়ে সে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।

❑

রাত তখন তিনটা হবে।

গভীর রাতেও আমির আলি সাহেব তার গবেষণাগারে বসে কি যেন করছিলেন। তাঁর চারপাশে অনেকগুলো শিশিতে নীলাভ তরল পদার্থ রয়েছে। এসব নিয়েই তিনি পরীক্ষা চালিয়ে চলছেন।

কতকগুলো অদ্ভূত ধরনের যন্ত্রও রয়েছে গবেষণাগারের এক পাশে। মাঝে মাঝে এসব যন্ত্র চালু করে দেখছিলেন তিনি।

হঠাৎ একটা লাল আলো জ্বলে উঠলো। অদ্ভুত যন্ত্রগুলোর একটির মধ্যে শব্দ হতে লাগলো।

সঙ্গে সঙ্গে আমির আলী সাহেব প্রায় ছুটে গেলেন যন্ত্রটির পাশে। একটা সুইচ টিপে ধরলেন তিনি। অমনি সেই কণ্ঠ স্বর শোনা গেলো, ডক্টর হামবার্টের গুরুগম্ভির গলা ...খান বাহাদুর! আজকাল তোমার কাজে

অবহেলা দেখছি ....মনে রেখো, আমাকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করলে সমূলে ধ্বংস হবে...

আমির আলীর কম্পিত গলা... আমি মোটেই কাজে অবহেলা করছিনা...... আপনাকে ফাঁকি দেওয়াও ....আমার .....

আমির আলীর কথা শেষ হয় না! ওপাশ থেকে শোনা যায় সেই কণ্ঠ---- আমার কাছে কিছু গোপন থাকবে না .... নীলাকে তুমি যতক্ষণ না আমার হাতে তুলে দিয়েছো ততক্ষণ আমি স্বস্তি পাচ্ছি না.... হাঁ আর একটি কথা ...

বলুন...

নীলা আজকাল একটি যুবকরে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়... কে সে.... আর তার উদ্দেশ্যই বা কি...

আমির আলী আমতা আমতা করে বললেন.... ও আমার বাসায় মালির কাজ করতো..... নাম রংলাল ....

একটা অট্টহাসির শব্দ .... হাঃ হাঃ হাঃ, মালি... মালির সঙ্গে নীলাকে বেশ লাগিয়ে দিয়েছো খান বাহাদুর .... নামটাও মন্দ না, রংলাল..... কিন্তু মনে রেখো আমির আলী.... নীলাকে তুমি যার সঙ্গেই লেলিয়ে দাও আমার হাত থেকে সে পরিত্রাণ পাবেনা.... তুমিও নিঃশেষ হয়ে যাবে.... কারণ সব তুমি জানো....

আমীর আলী ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন.... আপনি যা বলেছেন, সব খেয়াল আছে চ্যাটার্যী সাহেব.... রংলাল সামান্য মানুষ। ওকে সরাতে বিলম্ব লাগবেনা.... ছেলেটা বড় কাজের তাই আমি....

ও পাশের কণ্ঠ.... তাই তুমি একটা হীন নগন্য মালির সঙ্গে মেয়েকে মিশতে দিয়েছো.... তুমি খেয়াল না করলেও.... আমি খেয়াল করেছি .... ওরা দুজনা প্রায় গাড়ি নিয়ে ... বাইরে যায় ... হাঁ নীলাকে যেন কোন কথা বলোনা... আগামী অমাবস্যায় নীলাকে নিয়ে তুমি জঙ্গল বাড়ি ঘাটিতে ... হাজির হবে....... যদি কোন রকম অবহেলা করো বা চালাকী করো... আমার হাতে চাবিকাঠি আছে .... এখানে বসে সুইচ টিপবো.... সঙ্গে সঙ্গে তোমার গবেষণাগার ধ্বংস হয়ে যাবে, তার সঙ্গে ধ্বংস হবে তুমি ....

আমির আলী সাহেবের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো কিছু বলবার জন্য প্রস্তুত হলেন তিনি.... একটা কথা আজ আপনাকে বলবো... স্বয়ং দস্যু...

অমনি কে যেন কাঁধে হাত রাখলো। আমির আলীর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে তাকালেন তিনি মুহূর্তে, মরার মুখের মত বিবর্ণ হয়ে উঠলো তার মুখ-মণ্ডল। দেখলেন, জমকালো পোশাক পরা এক ব্যক্তি তার কাঁধে হাত রেখেছে।

ওপাশ থেকে ব্যস্ত কণ্ঠে.... খান বাহাদুর বললো স্বয়ং দস্যু .... কে কি কি বলতে চাচ্ছো বলো ...

আমির আলী একবার জমকালো মূর্তির দিকে তাকিয়ে কম্পিত গলায় বললো... বলছিলাম কোন দস্যুও পারবেনা আমার কাজে বাধা দিতে.... আমি আগামী অমাবস্যায় নীলা সহ জঙ্গল বাড়ি হাজির হবো...

ঠিক মনে রেখে কাজ করবে...

আচ্ছা সব মনে থাকবে...

লাল আলোটা নীভে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রটার মধ্যে একটা কর্ কর্ কর্ কর্ শব্দ হচ্ছিলো সেটা আর শোনা গেলোনা।

জমকালো মূর্তি বললো— আপনি এই মুহূর্তে আমার কথা বলে দিতে যাচ্ছিলেন আমির আলী! বলুন সত্যি কিনা?

ভয় পাংশু মুখে আমির আলী বললেন— না।

তবে দস্যু বা কি বলছিলেন?

কোন জবাব দেননা আমির আলী সাহেব।

আমি জানি আপনি যা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু যদি বলতেন তা হলে এতোক্ষণে আপনার প্রাণহীন দেহটা আপনার গবেষণাগারের মেঝেতে লুটিয়ে পড়তো?

আমির আলী সাহেব ভীত আতঙ্কিত দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন জমকালো মূর্তির হাতের আগ্নেয় অস্ত্রটির দিকে।

জমকালো মূর্তি বললো— আবার আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, কোন ক্রমে আমার নাম যেন কাউকে বলবেন না। ডক্টর হামবার্টকে তো নয়ই।

আচ্ছা আমি তাই করবো।

করবো নয় করতে হবে। আমার কথা বা আমার নাম কারো কাছে বলবেন না।

না, না, বলবো না। আমাকে মেরো না দস্যু বনহুর। আমি যে আমার প্রাণকে অনেক ভালবাসি।

শুধু আপনি নন! আপনার মত এ পৃথিবীর মানুষ সবাই নিজের প্রাণকে সব চেয়ে বেশি ভালবাসে। যদি প্রাণের মায়া করেন তবে নীরবে কাজ করে যান আমি আছি আপনার সঙ্গে।

কথাটা বলে বেরিয়ে যায় বনহুর।

খান বাহাদুর আমির আলী সাহেব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে থাকেন তার গবেষণাগারের আসনে!

ভোর হয়ে আসে এক সময়।

নীলা পিতার কক্ষে প্রবেশ করে অবাক হয়, তিনি ঘরে নেই।

নীলা চাকর বাকরকে ডাকা ডাকি শুরু করে দেয়।
সবাই এসে ঘিরে ধরে নীলাকে।
রংলালও বাদ যায় না, সেও এসে দাঁড়ায়।
নীলা ব্যস্ত কণ্ঠে বলে— আব্বুকে দেখছিনা কেনো?
একজন জবাব দেয়— মালিক তার গবেষণাগারেই আছেন।
অবাক কণ্ঠে বলে নীলা— আব্বু সমস্ত রাত আজ গবেষণাগারে কাটিয়েছেন। আশ্চর্য মানুষ তিনি। এসো রংলাল, আব্বু কি করছেন দেখে আসি।
নীলার পিছনে পিছনে চলে রংলাল।
গবেষণাগারে প্রবেশ করে নীলা বিস্ময়ে হতবাক হয়। আমির আলী সাহেব চেয়ারে বসে আছেন আড়ষ্ট হয়ে।
নীলা ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকে— আব্বু? আব্বু তুমি সমস্ত রাত এখানে ছিলে?
আমির আলী সাহেবের এতোক্ষণে যেন হুস হলো তিনি বললেন এ্যাঁ। কি বললি মা? আমি আমি সমস্ত রাত গবেষণাগারে ছিলাম?
হাঁ আব্বু তুমি সমস্ত রাত এখানে কাটিয়েছো?
কাজ, কাজ করছিলাম মা।
কাজ সারাদিন, সারারাত তুমি এতো কি কাজ করো আব্বু?
তাইতো মা এতো কি কাজ করি? মা... মা নীলা।
আব্বু তোমার কি হয়েছে? এমন করছো কেনো?
কিছু না, চল, মা চল্ ঘরে যাই। আমাকে ধরতো বাবা রংলাল।
রংলাল আমির আলী সাহেবের একটা হাত ধরে।
আর এক পাশে ধরে নীলা।
চলতে চলতে বলে নীলা— তোমাকে এতো করে বললাম। রংলাল কে তোমার গবেষণাগারে নাও। ও তোমার কাজে অনেক সহায়তা করবে। হাঁ তাই নেবো মা তাই হবে। আগে অমাবস্যাটা পেরিয়ে যাক। অমাবস্যা। অমাবস্যার কি হয়েছে আব্বু? আমি কিছু বুঝতে পারছিনা।
না না কিছু না কিছু না। আমির আলী সাহেব কথাটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন।
রংলাল আর নীলা দু'জনা মিলে খান বাহাদুর সাহেবকে তার নিজের ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়।
নীলা খান বাহাদুর সাহেবের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।
রংলাল হাত দু'খানায় হাত বুলিয়ে বলে— কি হয়েছে মালিক আপনার?

আমির আলী সাহেবের দু'চোখে ভয় আর দুঃশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকান দরজা দিয়ে বাইরের দিকে। কিছু যেন বলতে চান কিন্তু বলতে পারছেন না।

রংলাল বসো— বসো আমার পাশে।

এইতো আমি আছি আপনার পাশে। বলুন কি হচ্ছে আপনার?

বুক বড় জ্বালা করছে। বুকে হাত বুলিয়ে দাও তো রংলাল।

এইতো দিচ্ছি মালিক। রংলাল আমির আলীর বুকে হাত বুলিয়ে চলে।

নীলা যেন আরষ্ট হয়ে গেছে। তার মুখখানা বড় বিপন্ন অসহায় লাগছে। আমির আলী সাহেব তাকে শিশুকাল থেকে মানুষ করে এসেছেন। তাঁকেই সে পিতা বলে জানে আজ যদিও তার মনে দ্বন্দ্ব তবু তার প্রতি ওর অসীম ভালবাসা শ্রদ্ধা আছে। হঠাৎ তার কি হলো ভেবে অস্থির হলো নীলা। তার দু'চোখে পানি ঝরে পড়তে লাগলো।

রংলাল বললো— ডাক্তার ডাকবো মালিক?

না। ডাক্তার ডেকে কি হবে! আমার কোন অসুখ হয়নি।

তবে অমন করছো কেনো আব্বু?

ও কিছু না মা। সেরে যাবে.... সেরে যাবে কিন্তু অঁ ..... ওরা আমাকে হত্যা করতে চায়।

হত্যা! তোমাকে হত্যা করতে চায়? কে কে তোমাকে হত্যা করতে চায় আব্বু?

না না, কেউ না, কেউ না..... ভয়-বিহ্বল চোখে তাকায় চারিদিকে।

রংলাল তখন আমির আলীর বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো, বললো, —কেউ আপনাকে মিছামিছি ভয় দেখিয়েছে। আপনি কোন কিছু ভাববেন না মালিক। আমি আছি আপনার সঙ্গে.....

এ্যাঁ.... তুমি-তুমি.... রংলাল আরও একজন আমাকে ঐ কথা বলেছে.... আমি আছি আপনার সঙ্গে .... হ্যাঁ ঐ কথাই সে বলেছে আমাকে।

কে, কে আপনাকে ঐ কথা বলেছে মালিক? বলুন আমাকে বলুন?

না না বলবোনা। বলবোনা...... রংলাল?

বলুন?

তুমি ওর নাম শুনেছো?

কার নাম আব্বু? কার কথা বলছো?

দস্যু বনহুর!

দস্যু বনহুর? এক সঙ্গে বলে উঠে নীলা আর রংলাল।

ঐ মুহূর্তে গাড়িবারান্দায় গাড়ি থামার শব্দ হলো।

উন্মুখ হয়ে সবাই প্রতিক্ষা করতে থাকে!
এমন সময় একটি লোক কক্ষে প্রবেশ করলো। তার চেহারা ঠিক বাঙ্গালী বা অবাঙালী নয়। বিদেশী তাতে কোন সন্দেহ নাই। হাতে একটি ব্যাগ, ব্যাগটি সাধারণ নয় একটু অদ্ভুত ধরনের।
আমির আলী সাহেব লোকটাকে দেখে শসব্যস্ত উঠে বসলেন। তার চোখে মুখে একটা উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটে উঠলো। তিনি রংলাল এবং নীলাকে সে কক্ষ ত্যাগ করার জন্য ইংগিত করলেন।
কিছুক্ষণ আমির আলী আর আগন্তুকের মধ্যে কি যেন আলাপ আলোচনা হলো তারপর বেরিয়ে গেলো লোকটা।
আমির আলী সাহেব ডাকলেন—রংলাল।
অদূরে কোথাও ছিলো ও! ব্যস্তভাবে আমির আলীর কক্ষে প্রবেশ করে, আমাকে ডাকছেন মালিক?
হাঁ শোন।
এগিয়ে এলো রংলাল।
নীলা কোথায়?
তার ঘরে চলে গেছে।
তুমি গাড়ি বের করো রংলাল। নীলার মুখে শুনেছি সুন্দর গাড়ি চালানো শিখেছো। আজ তুমি যাবে আমাকে নিয়ে।
আচ্ছা মালিক।
এই চিঠিখানা আমার কোটের পকেটে রাখো। ঐ যে খাটের পাশে কোট ঝুলছে...
রংলাল চিঠিখানা হাতে তুলে নিলো। কিন্তু সে তখন পকেটে না রেখে হাতের মুঠার আড়ালে নিজের জামার পকেটে রেখে গাড়ি বের করার জন্য চলে গেলো।
গ্যারেজে প্রবেশ করে প্রথমে পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে মেলে ধরলো চোখের সামনে। প্রথমেই নজরে পড়লো চিঠিখানার নিচের অংশ ... ডাঃ রায়, চিঠি খানা ইংরেজিতে লিখা, তাই আমির আলী সাহেব রংলালকে দিয়েছিলো ওটা ভাঁজ করে পকেটে রাখতে। তিনি মনে করেছিলেন রংলাল তো ইংরেজি পড়তে জানেনা ও কিছু বুঝবেনা।
রংলাল চিঠিখানা পড়ে বিস্মিত হলো, ডাঃ রায় জেল থেকে লিখেছেন—প্রিয় খান বাহাদুর—

তোমরা কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে দিব্য আরামে কাল কাটাচ্ছো আর আমি জেলে পঁচে মরছি। নীলাকে তুমি

হামবার্টের হাতে তুলে দিও। সে আমাকে উদ্ধার করে নেবে কথা দিয়েছে। জঙ্গল বাড়ি থেকে যে সুড়ঙ্গ পথটা তোমার বাড়িতে এসেছে। সেই সুড়ঙ্গ পথেই হামবার্ট আমাকে উদ্ধার করে নেবে। তুমি আজই জেলারের সঙ্গে দেখা করবে। সে যেন আমাকে কান্দাই থেকে অন্য কোন জেলে না পাঠায় সেই ব্যবস্থা করবে।"

তোমার হতভাগ্য বন্ধু
ডাঃ রায়।

কি করে ডাঃ রায় জেল থেকে এ চিঠি বাইরে পাঠিয়েছে ভেবে পায়না সে। তবে চিঠিখানা তার হাতে পড়ায় ভাল হলো। পুনরায় চিঠিখানা পকেটে রেখে গাড়ি বের করে আনলো রংলাল বেশী দস্যু বনহুর। ফিরে এলো সে আমির আলী সাহেবের কক্ষে।

আমির আলী সাহেব বললেন— গাড়ি বের করেছো রংলাল?

হাঁ মালিক করেছি।

দাও আমার কোটটা আমাকে পরিয়ে দাও।

রংলাল কোটটা হাতে নিয়ে গিয়ে পকেটে চিঠিখানা রেখে দিলো আলগোছে। তারপর কোটটা সে পরিয়ে দিলো আমির আলী সাহেবের গায়ে।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন আমির আলী সাহেব। রংলাল তাকে সহায়তা করলো।

নীলা হঠাৎ পথ আগলে দাঁড়ালো— আব্বু এই অসুস্থ শরীর নিয়ে কোথায় যাচ্ছো?

আমির আলী সাহেব বললেন— আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি মা।

এই অসুখ শরীরে তোমার বাইরে যাওয়া উচিৎ হবে না। রংলাল তুমি যাও! আব্বুকে আমি বাইরে যেতে দেবোনা।

এবার আমির আলী সাহেব বিরক্ত ভরা কণ্ঠে বললো— তুমি বুঝবে না, আমার জরুরী কথা আছে তার সঙ্গে। না গেলেই নয়....

আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

সেকি মা তুমি যাবে তা কি করে হয়।

তোমার এ শরীর নিয়ে তোমাকে একা ছেড়ে দেবোনা।

একটু হেসে বললেন আমির আলী— রংলাল তো আমার সঙ্গেই যাচ্ছে।

নীলা এরপর আর কোন কথা বলে না, সরে দাঁড়ায় পথ ছেড়ে।
আমির আলী সাহেব রংলাল সহ বেরিয়ে যান।
জেলারের বাস ভবনে গিয়ে দেখা করলেন তার সঙ্গে।
কান্দাই শহরে আমির আলী সাহেবের বেশ নাম ডাক ছিলো। তাই সবাই তাকে সমিহ করতো।
জেলার সাহেব এ ব্যাপারে ভেবে দেখবেন বলে কথা দিলেন। ডাঃ রায় বয়সী মানুষ এই কারণে তাকে বাইরের কোন জেলে পাঠাতে বারণ করলেন বলেই আমির আলী সাহেব বলেছিলেন জেলার সাহেবকে।
রংলাল বেশী বনহুর যখন জেলারের বাসায় এসে উপস্থিত হলো তখন তার মনে একটা আশঙ্কা ছিলো। পুলীশ মহলের অনেকেই তার আসল রূপ চেনে কাজেই সুষ্ঠুভাবে তার আজ ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে কিনা কে জানে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বনহুর বিনা দ্বিধায় ফিরে এলো আমির আলীর বাস ভবনে।
আমির আলী সাহেব এসেই কন্যার ঘরে প্রবেশ করে তাকে বললেন— এই তো ভাল ভাবে ফিরে এলাম মা।
এক সঙ্গে দুপুরে খাবেন বললেন তিনি নীলাকে।
বনহুর কিন্তু সব সময় সন্ধানে রইলো। এই বাড়ির কোথাও একটি সুড়ঙ্গ পথ আছে যে পথে সুদূর কান্দাই পর্বতের জঙ্গল বাড়ি ঘাটিতে গিয়ে পৌঁছানো যায়।
আজকাল আমির আলী সাহেব রংলালকে সর্বক্ষণ তার পাশে পাশে রাখেন। তার বড় ভয় দস্যু বনহুরকে, আবার সে কখন কোন মুহূর্তে এসে পড়বে কে জানে। দস্যু বনহুর তাকে বলছিলো "আমি সর্বক্ষণ আপনার সঙ্গেই আছি" কথাটা আমির আলী সাহেব এক মুহূর্তের জন্য ভুলে যাননি। এবং সেই কারণেই তিনি দুঃসাহসী শক্তিশালী রংলালকে নিজের সঙ্গী করে নিয়েছেন।
অবশ্য গবেষণাগারে তিনি যখন তখন রংলালকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলেন! গবেষণাগারে তিনি কাউকে নিতে রাজি নন।
রংলালকে গবেষণাগারে না নিলেও সে গবেষণাগারের অভ্যন্তরের সব খবরই রাখে। একদিন সে গোপন সুড়ঙ্গ মুখও আবিষ্কার করে ফেলে।
গবেষণাগারের মধ্যে একটি দেয়ালে এই সুড়ঙ্গ মুখ ছিলো। আমির আলী সাহেব একদিন এই পথে ভিতরে প্রবেশ করে।
রংলাল বেশী বনহুর সব লক্ষ্য করছিলো তার কাজের ফাঁকে। বৃদ্ধ আমির আলী মনে করেছিলেন, সে এদিকে মনোযোগ দেয়নি, তার কাজ সে করে চলেছে।

কিছু পরে বেরিয়ে এসেছিলেন আমির আলী সাহেব সে সুড়ঙ্গ মধ্য থেকে।

বনহুরের চোখ দুটো দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো সেই মুহূর্তে।

আমির আলী সাহেব গবেষণাগার থেকে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন—রংলাল তুমি বড় ভাল ছেলে তাই তোমাকে আমার এতো ভাল লাগে। তুমি পারবে আমার গবেষণাগারের কাজে সাহায্য করতে?

বলেছিলো বনহুর— পারবো।

পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন আমির আলী সাহেব— সাবাস। তোমার মাইনে বাড়িয়ে দেবো আরও একশ' টাকা।

খুশি হয়ে হেসেছিলো ও।

❑ আপন মনে কাজ করছিলো সেদিন বনহুর।

নীলা কখন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি বনহুর।

নীলা বলে—সব সময় কাজ নিয়ে মেতে আছো। একটিবার তোমার অবসর হবেনা মনির?

আংগুল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ায় বনহুর।

নীলা নির্নিশেষ নয়নে তাকায় ওর মুখের দিকে, তারপর বলে— আজ আব্বুর কাছে তোমায় ছুটি নিতে হবে।

কেনো?

অনেক দূরে যাবো।

কোথায়?

যেখানে কাজ নেই— তুমি ব্যস্ত থাকবে না।

একটু হেসে বলে বনহুর—বেশ আমি রাজি কিন্তু....

কোন কিন্তু নয় তৈরি থাকবে আমি তৈরি হতে চললাম। নীলা চলে গেলো সেখান থেকে আজ নীলা সুন্দর করে সেজেছে।

এসে দাঁড়ালো বনহুরের পাশে— কই হলো তোমার?

বনহুর পকেট থেকে রুমালখানা বের করে মুখমণ্ডল মুছে নিয়ে বললো—চলো।

নীলা আর বনহুর যখন গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো তখন খানসামা হাসান তীক্ষ্ম নজরে লক্ষ্য করছিলো। বনহুর আর নীলার গাড়িতে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে সে তার নিজস্ব কক্ষে চলে গেলো এবং একটা ক্ষুদে ওয়্যারলেস যন্ত্র বের করে সব কথা সে জঙ্গল বাড়ি ঘাটিতে জানিয়ে দিলো।

জঙ্গল বাড়ি থেকে আদেশ এলো.... হাসান তুমি তোমার আত্ম গোপনকারী গুণ্ডাদলকে জানিয়ে দাও। যেখানে ওরা যাবে যেন ফলো করে এবং ফেরার পথে গাড়ি আটক করে রংলালকে হত্যা করে ফেলে। নীলাকে সংজ্ঞাহীন করে ফেলবে তারপর তাকে বাসায় পৌঁছে দেবে। রংলালকে হত্যা করতে পারলে তোমার কাজে উন্নতি হবে মনে রেখো...

এখানে যখন ছদ্মবেশী খানসামা ওয়্যারলেসে কথা বলছে তখন বনহুর আর নীলা সচ্ছমনে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। আজ নীলা বললো— চলো কান্দাই নদীর ধারে যাবো। আজ বহুদূরে চলো। শহরের কোন কোলাহল আমাদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করবেনা।

বেশ কটাদিন ওরা বাইরে বের হয়নি তাই মনটা হাঁপিয়ে উঠেছিলো, বললো বনহুর— বেশ চলো, বনহুর গাড়ির গতি কান্দাই নদীর পথে ফিরিয়ে নিলো।

নীলাকে আজ বড় আনন্দমুখর লাগছে।

বনহুর আপন মনে গাড়ি চালিয়ে চলেছিলো দৃষ্টি তার সম্মুখের পথে।

নীলা মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছিলো বনহুরকে।

বনহুরের ঠোঁটের কোণে মদু হাসির রেখা লেগেছিলো।

শহর ছেড়ে নির্জন পথে গাড়ি চলতে শুরু করলো।

এই পথই কান্দাই নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছেছে।

বনহুর বা নীলা কেউ লক্ষ্য করেনি তাদের গাড়িখানাকে ফলো করে একটা বড় গাড়ি এগিয়ে আসছে। গাড়িখানা অবশ্য অনেক অনেক দূরে রয়েছে যাতে ওরা টের না পায়। গাড়িতে বেশ কিছু সংখ্যক লোক সূতীক্ষ্ম ধার ছোরা নিয়ে বসে আছে। চোখে মুখে তাদের হিংস্রতার ছাপ।

গাড়িখানা আরও কিছু অগ্রসর হবার পর একটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো। নেমে পড়লো গাড়ির লোকগুলো এক এক জনের ভীষণ চেহারা, পরনে প্যান্ট গায়ে ডোরা কাটা গেঞ্জী কোমরের বেলটে সূতীক্ষ্ম ধার ছোরা ঝুলছে।

লোকগুলো গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির চারপাশে জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়লো। আত্মগোপন করে বসে রইলো তারা। নীলা আর রংলাল—এর গাড়ি এলে আক্রমণ চালাবে। এক এক জনের চোখগুলো ক্রুদ্ধ শার্দ্দুলের মত জ্বলছে।

নির্জন নদীর তীরে এসে দাঁড়ালো বনহুর আর নীলা।

বেলা শেষের অস্তাচলগামী সূর্যের শেষ আলোকরশ্মি নদীর রূপালী জলে অপূর্ব শোভা বিস্তার করেছিলো। কতকগুলো নৌকা পাল তুলে ভেসে চলেছে কোন অজানা পথে।

নীলা বললো— জানো কেনো তোমাকে নিয়ে এলাম আজ এখানে?

আমি জ্যোতিষী নই নীলা বুঝবো কেমন করে।
সত্যি তুমি.... না থাক বলবোনা।
বলো আমি কি?
বোকা।
একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করার ভান করে বলে বনহুর—সবাই আমাকে বোকা বলে, তাইতো আমার এতো আফসোস নীলা।
তাই নাকি?
হাঁ।
শোন মনির, তুমি আমার কাছে যতই নিজেকে বোকা সাজিয়ে রাখো আমি জানি তুমি কত বুদ্ধিমান।
তাতো বুঝলাম কিন্তু আজ আমাকে এখানে নিয়ে আসার কারণটা কি বুঝতে পারলাম না?
তোমাকে শপথ করতে হবে।
শপথ?
হাঁ।
কিসের শপথ নীলা?
আমাকে তুমি নিজের করে নেবে—কথা দাও?
নীলা!
না হলে আমি আর ফিরে যাবোনা।
বনহুরের দু'চোখে বিস্ময় ছড়িয়ে পড়ে।
নীলা বলে— এই নদী বক্ষে আমি নিজকে বিসর্জন দেবো।
এ জন্যই তুমি আজ আমাকে এখানে নিয়ে এসেছো—
তাছাড়া কোন উপায় ছিল না। আমি জানি তুমি একদিন আমাকে ছেড়ে চলে যাবে।
তাই এই নির্জন নদী তীর তোমার পছন্দ...
যদি মনে করো তবে তাই....এখানে ছাড়া তোমাকে এমন নিবিড় করে পাবোনা জানতাম।
নীলা তুমি এখনও আমার আসল পরিচয় জানোনা। আমি কে; কি আমার পেশা! কোথায় আমি থাকি.......
ওসব কিছু আমি জানতে চাই না মনির। তুমি আমার অজানা অচেনা বন্ধু এই তো তোমার পরিচয়!
নীলা! আমাকে ভাববার সময় দাও।
না না, তুমি আমাকে কথা দাও! কথা দাও মনির...

কিন্তু আগামী অমাবস্যা পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। তারপর আমি তোমায় কথা দেবো নীলা।

সত্যি!

হাঁ সত্যি।

নীলা বনহুরের বুকে মাথা রেখে বলে— তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবোনা মনির।

বনহুরের মুখমণ্ডলে একটা গভীর চিন্তা রেখা ফুটে উঠে। সে ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বলে— নীলা চলো এবার আমরা ফিরে যাই! একি আবার তোমার চোখে পানি! তুমি কাঁদছো?

তোমার মত পাষাণ হৃদয় পুরুষ আর নেই।

মিথ্যা বলোনি নীলা। এ অপবাদ আমার আছে। নীলা একটা গান শোনাবেনা আজ? নির্জন নদীর তীরে তোমার গানের সুর দোলা জাগাবে।

নীলা নত মুখে বসে রইলো।

বনহুর নীলার মুখখানা তুলে ধরলো— নীলা!

বলো?

একটা কথা বলবো?

বলো?

তুমিই একদিন বলেছো, কে যেন তোমার কাছ থেকে তোমার রত্ন ছিনিয়ে নিতে চায় এসব জেনেও তুমি নিজকে বিপন্ন করতে চাও?

না না ও কথা তুমি মুখে এনোনা। আমি— আমি তাকে চিনিনা! আমি তাকে ভয় করিনা মনির। সে যা চায় আমি তাই দেবো তবু আমি তার কাছে ভিক্ষা চেয়ে নেবো তোমাকে........ বনহুরের কোলে মুখ গুঁজে কান্নায় ভেংগে পড়ে নীলা।

পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে থাকে বনহুর, এ কান্না সে বহু দেখেছে। তাকে যে ভাল বেসেছে সেই শুধু কেঁদেছে। নীলা যে কাঁদবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। নীলাকে স্বচ্ছ করে তোলার চেষ্টা করে বনহুর, ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে— এ ভাবে কাঁদলে আমি আর আসবোনা নীলা। ভেবেছিলাম তুমি আমায় একটা নতুন গান শোনাবে।

তবু নীলা ফুলে ফুলে কাঁদে।

বনহুর বলে আবার— এতো সুন্দর সন্ধ্যাটা নষ্ট করে দিলে তো! উঠো নীলা, চেয়ে দেখো কত সুন্দর ঐ নদীর পানি......

নীলা উঠে বসলো।

বনহুর নিজের হাত দিয়ে নীলার চোখের পানি মুছে দিয়ে বললো— কি সুন্দর দৃশ্য। একটা গান গাও নীলা। আজকের সন্ধ্যাটা সার্থক হোক।

আজ গাইতে পারবো না মনির।
কেনো?
মনটা বড় অস্থির লাগছে।
ও কিছুনা নীলা তুমি গাও। সত্যি তোমার গান আমার বড় ভাল লাগে।
মনির...
ভুলে যাও নীলা সব ব্যথা-বেদনা।
কি জানি কেনো আমার বুকটা দুরু দুরু কাঁপছে; হঠাৎ যদি সে এসে পড়ে তাহলে?
কার কথা বলছো নীলা?
ও নাম মুখে আনতে চাইনা।
বুঝেছি, দস্যু বনহুরের কথা বলছো নীলা?
সত্যি ও নাম ভয়ঙ্কর...
হঠাৎ অট্টহাসিতে ভেংগে পড়ে বনহুর। নির্জন নদীতীর যেন কেঁপে উঠে।
নীলা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে বনহুরের মুখের দিকে। বনহুরের হাসি থেমে যায়। নীলা বলে— থামলে কেনো আরও হাসো। সত্যি তুমি যখন হাসো তোমাকে অদ্ভুত সুন্দর লাগে।
তাই নাকি?
হাঁ- তুমি অপূর্ব মনির।
নীলা! বনহুর নীলাকে ধরে ফেলে গভীর আবেগে। সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত করে দেয় ওকে, তারপর বলে— কই গান গাইবে না?
হাঁ গাইবো। লজ্জাতুর ভাবে বলে নীলা।
ঐ গানটা গাও নীলা যে গান তুমি সেদিন গেয়েছিল।
বেশ তাই গাইছি।
নীলা গান গায়।
বনহুর অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে মোহমুগ্ধের মত।
গান গাওয়া শেষ হলে বলে বনহুর— চলো নীলা এবার ফিরে যাই?
চলো।
নীলা আর বনহুর উঠে দাঁড়ায়।
গাড়ির পাশে ফিরে আসে তারা।
তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে গেছে। চারিদিকে অন্ধকার ক্রমে জমাট বেঁধে উঠেছে।
বনহুর ড্রাইভ আসনে তার পাশে নীলা।

ওদিকে জঙ্গলে আত্মগোপন করে প্রতিক্ষা করছে গুণ্ডা দলটি।
গাড়ির শব্দ পেয়ে ওরা তটস্থ হয়ে উঠে।
প্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়ায় সবাই, ছোরাগুলো খুলে নেয় খাপ থেকে।
বনহুর আর নীলার গাড়ি এগিয়ে আসছে!
সার্চ লাইটের আলো ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তার উপর।
হঠাৎ বনহুর বলে উঠে— নীলা বিপদের জন্য প্রস্তুত হও......
সে কি! ভয়ার্তকণ্ঠে বললো নীলা।
বনহুর ব্যস্ত গলায় বললো— সামনে তাকিয়ে দেখো...
নীলা ভয় বিহ্বল কণ্ঠে বললো— ওকি রাস্তা বন্ধ কেনো? কারাপথের মধ্যে বাঁশ দিয়েছে?
নিশ্চয়ই আমাদের শত্রু হবে.... বনহুরের কথা শেষ হয়না জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে বিশ বাইশ জন জোয়ান পুরুষ।
সম্মুখে রাস্তা বন্ধ।
বনহুর বাধ্য হলো গাড়ি থামিয়ে ফেলতে।
সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির চারপাশে ঘিরে গাঁড়ালো একদল লোক। কি ভয়ঙ্কর চেহারা এক একজনের। হাতে সবার সূতীক্ষ্ণধার ছোরা।
বনহুর হঠাৎ এমন একটা অবস্থার জন্য একটুও ঘাবড়ে গেলো না। সে নীলার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিলো।
ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে নীলার মুখ!
বনহুর দ্রুত কণ্ঠে বললো— গাড়ি থেকে নেমোনা নীলা.... কথাটা বলেই বনহুর গাড়ি থেকে নেমে পড়লো।
ততক্ষণে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে দুর্ধর্ষ দল। বনহুর কৌশলে শয়তানদের ছোরা থেকে নিজকে বাঁচিয়ে সরে দাঁড়ালো এবং সঙ্গে সঙ্গে সে প্রচণ্ড ঘুষি চালিয়ে চললো।
সমস্ত শয়তান মিলে আক্রমণ চালিয়ে চলেছে। একা বনহুর পেরে উঠা মুস্কিল। তবু সে তার বজ্র মুষ্ঠিতে এক একজন দুর্ধর্ষকে ধরাশায়ী করে চলেছে।
ভীষণ লড়াই চললো।
নীলা কি করবে ভেবে পাচ্ছেনা, সে ভাবছে দস্যু বনহুর তার দলবল নিয়ে রংলালকে হত্যা করার জন্যই আক্রমণ চালিয়েছে।
অল্পক্ষণেই নীলা আশ্চর্য হয়ে যায়। দেখতে পায় দুর্ধর্ষ শয়তানের দল কে কোন দিকে পালাচ্ছে। কয়েকটা রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে গাড়ির পাশে।
বনহুর এগিয়ে আসে হাতে তার একখানা রক্ত মাখা ছোরা।
নীলা গাড়ি থেকে নেমে ঝাপিয়ে পড়ে ওর বুকে— মনির।

হঠাৎ ওর দেহের দিকে নজর পড়তেই শিউরে উঠে নীলা। সমস্ত জামা রক্তে ভেসে যাচ্ছে!

নীলা ভাল করে লক্ষ্য করতেই দেখলো ওর মাথার মধ্য থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কপালে মুখে চোখে আর জামায়।

নীলা আর্তনাদ করে উঠে— মনির..

বনহুর শান্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে— ও কিছু না নীলা। চলো, গাড়িতে চলো! ছোরাখানা ছুড়ে ফেলে দিলো সে।

নীলা গাড়িতে চেপে বসে।

বনহুর ড্রাইভিং আসনে বসলো কিন্তু সমস্ত চোখে মুখে রক্তের বন্যা ঝরে পড়ছে যেন।

নীলা ব্যাকুল কণ্ঠে বললো— তুমি গাড়ি চালাতে পারবে তো?

পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুখের রক্ত মুছে নিলো বনহুর।

গাড়ি উলকা বেগে ছুটে চলেছে।

নীলা শুধু বিস্মিত হতবাকই হয়নি তার হৃদয় অভূতপূর্ব আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছে। এতো দুঃখ ব্যথার মধ্যেও খুশির উচ্ছ্বাস। তার মনির এতোগুলো দুর্ধর্ষকে পরাজিত করেছে।

নীলা অবাক চোখে প্রাণ ভরে ওকে দেখছে।

নিজের আঁচল দিয়ে ওর রক্ত মুছে দিচ্ছিলো সে বার বার।

গাড়িবারান্দায় গাড়ি পৌঁছতেই সর্ব প্রথম এসে দাঁড়ালো খান বাহাদুর সাহেবের পুরোন খানসামা হাসান। রংলালকে ড্রাইভিং আসনে দেখে সে প্রথমে হকচকিয়ে গেলো। নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। কারণ হাসান জানে আজ রংলালের মৃত্যু সুনিশ্চিত। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসেছে নীলার সংজ্ঞাহীন দেহটা গাড়ি থেকে নামিয়ে নেবে বলে।

হাসান থ মেরে দাঁড়িয়ে আছে।

নীলা বললো— দেখছো কি? শীগগীর আব্বুকে ডেকে আনো।

হাসান ছুটলো খান বাহাদুর সাহেবকে ডাকতে।

ততক্ষণে অন্যান্য লোকজন ছুটে এসে গাড়িখানাকে ঘিরে ফেলেছে। শসব্যস্তে ছুটে এলেন খান বাহাদুর সাহেব। বনহুরকে রাক্তাক্ত অবস্থায় দেখে তিনি হায় হায় করে উঠলেন। নিজ হাতে তিনি ওকে ধরে নিয়ে চললেন ওর ঘর অভিমুখে।

সবার মুখে এক কথা কেমন করে এ অবস্থা হলো।

নীলা শুধু একবার বলেছিলো— দস্যু বনহুরের দল রংলালকে হত্যা করতে চেয়েছিলো..... এর বেশি সে আর কিছু বলেনি।

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার এলেন।

খান বাহাদুর আমির আলী সাহেবের নিজস্ব ডাক্তার হোরিস্‌স্মিথ।
তিনি এসে বনহুরের অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হলেন কারণ ওর মাথার ক্ষতটা অত্যন্ত গভীর হয়েছিলো। তাড়াতাড়ি ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন বটে কিন্তু বললেন—কিছুটা রক্তের প্রয়োজন।
খান বাহাদুর সাহেব হকচকিয়ে গেলেন। এ সময়ে হঠাৎ কোথায় তিনি রক্ত পাবেন।
নীলা এগিয়ে এলো— ডাক্তার স্মিথ আমি রক্ত দেবো।
অবাক চোখে তাকালেন ডাক্তার স্মিথ নীলার দিকে। রংলাল চাকর বইতো নয় তার জন্য নীলা নিজে রক্ত দেবে।
নীলা বুঝতে পারলো ডাক্তার স্মিথের মনোভাব। সে বললো— আপনি বিলম্ব করবেন না ডাক্তার স্মিথ। ও যেন সুস্থ হয়ে উঠে এই কাজ করুন।
খান বাহাদুর আমির আলী কন্যার কথাটা সম্পূর্ণ ফেলতে পারলেন না। কারণ রংলালকে নীলাই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলো।
নীলার কথাটা অবশ্য বনহুর শুনতে পায়নি। কারণ ডাক্তার স্মিথের সঙ্গে অপর এক কক্ষে এসব আলাপ আলোচনা চলছিলো।
ডাক্তার স্মিথ নীলার শরীর থেকে রক্ত নিয়ে বনহুরের শরীরে পুশ করলেন।
তখন খানসামা হাসান সব লক্ষ্য করছিলো। হাসান নানা কাজের ফাঁকে দেখছিলো সব কিছু। নীলা যে রংলালের জন্য রক্ত দিলো এ সংবাদ হাসান সঙ্গে সঙ্গে সুদূর জঙ্গলবাড়ি ঘাটিতে পৌঁছে দিলো তার ক্ষুদে ওয়্যারলেস যন্ত্রের মাধ্যমে।
জঙ্গলবাড়ি ঘাটির মালিক হামবার্ট চাটার্যী যখন শুনলো রংলাল নিহত হয়নি এবং তার জন্য নীলা নিজ শরীরের রক্ত দিয়েছে তখন সে অগ্নিমূর্তি ধারণ করলো। তৎক্ষণাৎ তার দলবলকে ডেকে পাঠালেন।
বনহুরের কাছে ভীষণভাবে মার খেয়ে হামবার্টের দল মৃতবৎ হয়ে পড়েছিলো। মালিকের আহ্বানে না গিয়ে পারলো না তারা।
হামবার্ট তাঁর জঙ্গল বাড়ি বাটির এক গোপন গুহায় পায়চারী করছিলো। সমস্ত শরীরে তার অদ্ভুত পোশাক। এ পোশাক সে সর্বক্ষণ পরে থাকে। গণ্ডারের চামড়া দিয়ে এ পোষাক তৈরি কাজেই এই পোশাক পরা অবস্থায় তার দেহে কোন গুলি বা ছোরা বিদ্ধ হয় না।
হামবার্ট অত্যন্ত সুচতুর আর হিংস্র।
বয়স অর পঞ্চাশের কাছাকাছি কিন্তু চেহারায় কোন বার্ধক্যের ছাপ পড়েনি। একটি জীবন্ত শয়তান বলেই মনে হয় তাকে। চোখ দুটো ক্ষুব্ধ শার্দ্দুলের মত। মাথায় চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাটা। দাঁতগুলো বেশ বড়

আর লালচে ধরনের। সবচেয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণীয় সে হলো তার বাম পা। দেহের চেয়ে ওর বাম পা টি অত্যন্ত খাটো ছিলো।

পায়চারী বন্ধ করে ফিরে তাকায়।

তার প্রধান সহকারী জাহাঙ্গীর হিথ এসে দাঁড়ালো তার পিছনে। ক্ষত বিক্ষত আহত অবস্থায় সেই শয়তানগুলো এসে দাঁড়িয়েছে যারা গত সন্ধ্যায় আক্রমণ চালিয়েছিলো বনহুর আর নীলার উপর।

গর্জে উঠে শয়তান হামবার্ট —অপদার্থের দল তোমরা এতোগুলো জোয়ান একজন লোককে কাবু করতে পারলে না।

সমস্ত জোয়ান তখন কাঁপছে থরথর করে।

হামবার্টের দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। সে টেবিল থেকে মেশিনগান তুলে নিয়ে ব্রাস ফায়ার করলো। সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লো আহত জোয়ানগুলো।

রক্তে রাঙ্গা হয়ে উঠলো জঙ্গল বাড়ি ঘাটির পাথুরে মেঝে।

হামবার্ট তার সহকারী হিথকে নির্দেশ দিলো— লাশগুলো পর্বতের নিচে ফেলে দাও। যতসব জঞ্জাল।

হিথ আদেশ পালন করার জন্য বেরিয়ে গেলো।

একটু পরে ফিরে এলো হিথ সঙ্গে কয়েকজন বলিষ্ঠ লোক। তারা মৃত দেহগুলো ধরাধরি করে নিয়ে চললো।

হামবার্ট তার সহকারীকে বললো— শুনলাম রংলাল বেশ জখম হয়েছে। তার শরীরে রক্ত প্রয়োজন হওয়ায় নীলা নাকি রক্ত দিয়েছে। নীলার দরদ কত বুঝতেই পারছো, ওর জন্য নিজের রক্ত সে দিলো।

সব আমি শুনেছি মালিক।

হাসানকে জানিয়ে দাও ডাক্তার স্মিথকে সাবধান করে দিতে। সে যেন কোন ক্রমে ইন্জেকশানে বিষ মিশিয়ে রংলালের শরীরে পুশ করে। যদি না করে তা হলে আমার হাত থেকে সে রেহাই পাবে না। হিথ তুমি এক্ষুণি ওয়্যারলেসে জানিয়ে দাও।

আচ্ছা মালিক।

শোন আর একটি কথা, ডাঃ রায় আমির আলীকে বলে দিয়েছে তার কন্যা নীলাকে আমার হাতে তুলে দিতে। তাকে আমি কান্দাই জেল থেকে সুড়ঙ্গ পথে উদ্ধার করবো বলে আশ্বাস দিয়েছি। ডাঃ রায় মুক্ত না হলে আমাদের ব্যবসা শিথিল হয়ে আসছে। সে একাই প্রতিমাসে একশত থেকে দু'শত পাউণ্ড রক্ত এবং দুইটি আই ব্যাঙ্ক নর চক্ষু দিতো। কান্দাই থেকে ব্যবসা তুলে নিতে হচ্ছে শুধু ডাঃ রায় না থাকায়।

কথাগুলো বলে থামলো হামবার্ট।

এমন সময় ছুটে এলো একটি লোক, সে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো— উড়ন্ত ভিপসা এসেছে স্যার।

হামবার্ট চঞ্চল হয়ে উঠলো— এবার নিয়ে তিনবার আমি এদের ফিরিয়ে দিলাম হিথ। বিশ লক্ষ টাকার মাল ওরা আমাদের জঙ্গল বাড়ি ঘাটি থেকে পাবে।

হিথ- এর মুখ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিলো।

হামবার্ট লিফটে চেপে দাঁড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে লিফট উপরে উঠে এলো। একটি সুড়ঙ্গ পথ। ঐ সুড়ঙ্গ পথে একটি গাড়ি দাঁড়িয়েছিলো। হামবার্ট গাড়িতে চেপে বসলো।

অল্পক্ষণেই গাড়ি সুড়ঙ্গ পথের বাইরে এসে পড়লো। সবুজ ঘাসে ঢাকা বিস্তৃত প্রান্তর!

একটি অদ্ভুত গাড়ি অপেক্ষা করছে সেখানে।

গাড়ির ড্রাইভারের দেহে অদ্ভুত পোশাক। যে ধরনের পোশাক পরে ডাঃ রায় তার হত্যালীলা চালাতো। এই লোমশ দেহী লোকটা হামবার্টকে দেখে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো। সাংকেতিক ভাষায় কি যেন সব আলাপ করলো ওরা দু'জনা।

লোকটা গাড়িতে উঠে বসলো তারপর গাড়ি ছুটলো। কিছুদূর অগ্রসর হতেই গাড়ির দু'পাশ থেকে বেরিয়ে পড়লো দুটি পাখা। এবার গাড়িখানা প্লেনের মত আকাশে উড়ে উঠলো।

হামবার্ট ফিরে এলো তার সুড়ঙ্গমধ্যে গাড়িখানার পাশে। এ গাড়িখানাও ছিলো বিস্ময়কর। গাড়িতে চেপে বসার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চলতে শুরু করে এবং ঠিক জায়গায় এসে থেমে যায়।

হামবার্ট অল্পক্ষণে পৌঁছে গেলো তার জঙ্গলবাড়ি ঘাটির নির্দিষ্ট গুহায়। সমস্ত গুহায় নানা ধরনের যন্ত্রপাতি আর ডায়নামা ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত মেশিন সাজানো রয়েছে। এখানেই রয়েছে নানা রকম সুইচ। এমন একটি সুইচ আছে যাতে চাপ দিলেই কান্দাই শহরে আমির আলীর গবেষণাগার ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধু তাই নয় একটি ভয়ঙ্কর মেশিন আছে যা চালু করলে সঙ্গে সঙ্গে একটি দুর্গম সুড়ঙ্গ পথের সৃষ্টি হবে।

হামবার্ট ডাঃ রায়কে জেল থেকে বের করার জন্য এ মেশিন ব্যবহার করবে। এ ছাড়াও আরও কতকগুলো ভয়ঙ্কর এবং অদ্ভুত মেশিন আছে যা অতি সাংঘাতিক মারাত্মক।

হামবার্ট-এর আদেশ তার সহকারী হিথ খানসামা হাসানকে জানিয়ে দিলো।

ঐ মুহূর্তে নীলা হাসানের কামরার পাশ কেটে রংলালের কামরায় যাচ্ছিলো হঠাৎ তার কাছে ভেসে এলো চাপা অস্পষ্ট একটি কণ্ঠস্বর ... হাসানের গলা, ডাক্তার স্মিথ আজ বৈকালে আসবেন বলে গেছেন। হাঁ কি বলবো তাকে .... আচ্ছা বিষ ইনজেকশানে মিশিয়ে রংলালের শরীরে পুশ করতে .... হাঁ ঠিক বুঝেছি... ডাক্তার স্মিথ এলে তাকে... আচ্ছা তার বাসায় যাবো... হাঁ এক্ষুণি তাকে জানিয়ে দেবো আপনার আদেশ..

নীলার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে উঠলো।

সে বুঝতে পারলো রংলালকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে। তাকে সেদিন সন্ধ্যায় হত্যা করতে চেষ্টা করা হয়েছিলো কিন্তু তা সম্ভব হয়নি তাই ডাক্তার স্মিথের দ্বারা তাকে বিষ দিয়ে হত্যা করা হবে। কে সেই ব্যক্তি যে এই হত্যা চক্রান্তের অধিনায়ক। তবে হাসান তার হয়ে কাজ করছে। নীলার মুখ রক্তাভ হয়ে উঠে। এই মুহূর্তে সে হাসানকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে কিন্তু তাতে কোন ফল হবে না। নীলা ধীরে ধীরে কাজ করবে। সর্বক্ষণ সে রংলালকে চোখে চোখে রাখবে...

হাসানের কথা শেষ হয়ে গিয়েছিলো নীলা বুঝতে পারে সে এখন বেরিয়ে আসবে তাই তাড়াতাড়ি সরে পড়ে সেখান থেকে।

বনহুরের কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পায় নীলা অঘোরে ঘুমাচ্ছে সে। নীলা এসে বসলো তার পাশে, অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো ওর অসুস্থ মুখের দিকে। বড় মায়া হলো নীলার কারণ সেই তাকে কাল সন্ধ্যায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলো না হলে ওর এ অবস্থা হতোনা।

ডাক্তার নীলার শরীর থেকে রক্ত নিয়ে ওর শরীরে দিয়েছে, বলেছেন ভয়ের কোন কারণ নাই। এবার সুস্থ হবে সে। নীলার চোখ দু'টো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু এই মুহূর্তে মনটা তার একেবারে বিষণ্ন হয়ে যায়। ওকে কি করে রক্ষা করবে।

হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে নীলা।

ঘুম ভেংগে যায় বনহুরের। চোখ মেলতেই ও দেখতে পায় নীলা কাঁদছে?

বনহুরের কণ্ঠ-স্বরে ওর কান্না আরও বেড়ে যায়। উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদে সে।

এমন সময় হাসান এক গেলাস দুধ এনে পাশে দাঁড়ায়— এই নাও রংলাল তোমার দুধ।

নীলা চোখ তুলে তাকায় হাসানের দিকে তারপর গম্ভীর গলায় বল্লে— তুমি যাও হাসান আমি ওকে দুধ খাইয়ে দেবো।

হাসান বিরক্ত হয় দুধের গেলাসটা সে টেবিলে রেখে বেরিয়ে যায়।

নীলা এবার দুধের গেলাসটা তুলে নেয় হাতে তারপর পাশের জানালা দিয়ে সব দুধ ফেলে দেয় বাইরে।

অবাক হয়ে যায় বনহুর।

নীলা শূন্য গেলাস হাতে ফিরে আসে বনহুরের শয্যার পাশে।

অবাক কণ্ঠে বললো বনহুর— দুধটা অমন করে ফেলে দিলে কেনো নীলা?

দুধ আমি নিজে তোমায় এনে দেবো মনির! আজ থেকে আমি তোমায় খাইয়ে দেবো।

নীলা তুমি আমার জন্য কত করছো। শুনলাম তুমি রক্ত দিয়েছো আমার শরীরে...

মনির তোমার শরীরে আমার রক্ত দিতে পেরেছি বলে আমার কি যে আনন্দ তুমি তা বুঝবেনা! সত্যি তোমার এই ঘটনার জন্য আমিই দায়ী কারণ আমি তোমায় সেদিন নিয়ে গিয়েছিলাম। না হলে আজ তোমার এ অবস্থা ঘটতো না।

হাসে বনহুর—নীলা আমার অদৃষ্টে যা ছিলো তাই হয়েছে। এর জন্য তুমি কেনো দায়ী হবে।

তোমাকে আমি রক্ষা করতে পারবো মনির। দস্যু বনহুর বলেছিলো সে আমার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নেবে তাই সে তোমাকে গত সন্ধ্যায় হত্যা করতে গিয়েও পারেনি এবার কৌশলে তোমাকে সে হত্যা করবে...

দস্যু বনহুর!

হাঁ সে বলেছিলো তোমাকে যেন আমি ভাল না বাসি। তোমাকে যেন ভুলে যাই.... মনির আমি তো বলেছি তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। এবার দস্যু বনহুর এলে বলবো— তুমি ওকে হত্যা না করে আমাকে করো... বাষ্পরুদ্ধ হয় নীলার কণ্ঠস্বর। ছুটে বেরিয়ে যায় নীলা।

একি এক মহা সমস্যা, তাকে যে নীলা গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছে। নীলাকে সে কি করে বোঝাবে সে যা চায় তা কোনদিনই সম্ভব নয়। নীলা ওকে নিজের করে পেতে চায়। এর পরিণতি কি হবে ভাবতে গিয়ে ওর মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠে।

এমন সময় নীলা এক গেলাস দুধ নিয়ে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে বনহুর তখন চোখ বুঝে পড়েছিলো।

ভাবছিলো নীলার কথা, ভাবছিলো গত রাতের কথা। তাকে হত্যা করার জন্য ভীষণভাবে চেষ্টা চলেছে। নিশ্চয়ই একটা দল তাকে সর্বক্ষণ ফলো করছে। কিন্তু তার আসল পরিচয় তারা জানে না। জানলে ওভাবে আক্রমণ চালাতে সাহসী হতো না। নীলার মনে সন্দেহ দস্যু বনহুর তার রংলালকে

তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায় মানে হত্যা করতে চায়। নীলার ভাবাটা অহেতুক নয় সে নিজেই এর জন্য দায়ী। নীলাকে নানাভাবে ভয় দেখিয়েও নীলার মন থেকে বনহুর রংলালকে সরাতে পারেনি...

নীলার উপস্থিতিতে বনহুরের চিন্তা ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বলে নীলা— দুধ খাও।

নীলা!

হাঁ একটু মাথা তোলো। নীলা বনহুরকে তুলে ধরে বাম হাতে আর ডান হাতে দুধের গেলাস ধরে তার মুখে।

বনহুর দুধ টুকু পান করে।

হাসান আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করলো।

নীলা কিন্তু সর্বক্ষণের জন্য ওর পাশে পাশে রয়েছে। এক মুহূর্ত সে বাইরে যায় না।

হাসান এলে বলে— তুমি যাও হাসান আমি আছি।

হাসান বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে যায়।

এক সময় ডাক্তার স্মিথ এলেন।

নীলার মুখ খানা কঠিন এবং গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

ডাক্তার স্মিথের সঙ্গে আমির আলী সাহেবও সেই কক্ষে এসেছেন রংলালকে দেখতে।

হাসান এসে দাঁড়ালো পাশে।

ডাক্তার স্মিথ যখন ইনজেকশান তৈরি করে নিচ্ছিলেন তখন নীলা বললো— না ওকে ইনজেকশান দেওয়া হবে না।

কক্ষ মধ্যে সবাই অবাক হয়ে গেলো!

আমির আলীর সাহেব বললেন— সেকি মা ওর যে ইনজেকশান দরকার।

হোক তবু আমি ইনজেকশান ওকে নিতে দেবো না।

বনহুরের চোখে মুখেও বিস্ময় ফুটে উঠে। হঠাৎ নীলা এমন করছে কেনো ভেবে পায়না সে।

ডাক্তার স্মিথ বললেন— ইনজেকশান না নিলে রোগী সুস্থ্য হবে কি করে?

সুস্থ্য হয়ে আর কাজ নেই ডাক্তার সাহেব আপনি যেতে পারেন।

অবাক হয়ে বলেন আমির আলী সাহেব— তুমি কি পাগল হলে নীলা! রংলাল যেভাবে আহত হয়েছে তাতে তার রীতিমত চিকিৎসার দরকার!

আব্বু আমি জানি ওর জন্য কি দরকার আর কি না দরকার।

ডাক্তার স্মিথের মুখখানা অসম্ভব গম্ভীর আর কঠিন হয়ে উঠেছে তিনি তার ঔষধের বাক্স পুনরায় গুছিয়ে নিলেন। একবার ডাক্তার স্মিথ হাসানের মুখে তাকিয়ে দেখে নিলেন তারপর উঠে দাঁড়ালেন।

আমির আলী সাহেব ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বললেন— একি করলি নীলা। ডাক্তার স্মিথ যে চলে যাচ্ছে?

ওকে যেতে দাও আব্বু।

ডাক্তার স্মিথ চলে গেলেন।

হাসানও সেই সঙ্গে কক্ষ ত্যাগ করলো।

আমির আলী সাহেব চিন্তিত কণ্ঠে বললেন— রংলাল সুস্থ্য না হলে অসুবিধা আছে নীলা।

আব্বু তোমার কিছু ভাবতে হবে না আমি ওর জন্য অন্য ডাক্তার ডাকবো

কি জানি মা তুই যা ভাল বুঝিস কর। বেরিয়ে গেলেন আমির আলী সাহেব।

নীলা বসলো ওর পাশে বুকে হাত বুলিয়ে বললো— আমি এক্ষুণি অন্য ডাক্তার ডাকছি তুমি কিছু ভেবোনা মনির।

কিন্তু তুমি ডাক্তার স্মিথকে ওভাবে কেনো বিদায় করলে নীলা?

এখন তুমি অসুস্থ্য। সুস্থ্য হয়ে উঠো তোমায় সব বলবো। মনির— দিন দিন আমি তোমাকে নিয়ে বড় চিন্তায় পড়েছি। তুমি জানোনা কত বড় এক চক্রান্ত চলছে তোমাকে হত্যা করার জন্য......

আমি জানি নীলা।

তুমি জানোনা ডাঃ স্মিথ আজ তোমাকে যে ইনজেকশান করতে যাচ্ছিলেন তা বিষাক্ত পয়জোন।

নীলা।

হাঁ মনির আমি সেই কারণেই তাকে বিদায় দিলাম।

বনহুর নীলার একখানা হাত মুঠায় চেপে ধরলো, তুমি সত্যি মহিয়সী নারী। আমাকে তুমি বাঁচালে......

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমাকে বাঁচাতে পারবো কিনা কে জানে। চলো মনির এ বাড়ি থেকে আমরা কোথাও চলে যাই?

নীলা তা হয় না।

কেনো? কেনো হয় না।

বনহুর নীরব।

নীলা ওর মুখে গালে হাত বুলিয়ে বলে, বলো মনির, কেনো হয় না।

আমিকে তুমি আজও জানো না নীলা। একজন অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তি আমি—

তুমি আমার কাছে অপরিচিত নও। তোমার যতটুকু আমি জেনেছি এটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট। নীলা বনহুরের বুকে মাথা রাখে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে হাসান আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করে।

বনহুরও মাথায় হাত বুলিয়ে বলে— তোমাকে বলেছি নীলা আগামী অমাবস্যা পর্যন্ত ধৈর্য ধরো। আমি তোমাকে সেদিন সব বলবো। কথা দেবো তোমাকে—

আর কত দিন তুমি আমাকে দূরে দূরে রাখবে বলো! মনির আমি তোমাকে নিজের করে পেতে চাই। তোমাকে স্বামী রূপে পাবো এই তো আমার কামনা— কথাগুলো বলে লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠে নীলা। বেরিয়ে যায় সে ঐ কক্ষ থেকে।

পাশের কক্ষে গিয়ে ডাক্তারকে ফোন করে নীলা।

একটু পরে ডাক্তার আসেন। তাদের নিজস্ব ডাক্তার স্মিত নয়। শহরের নাম করা বড় ডাক্তার।

নীলা পাশে বসে বনহুরের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারকে অনুরোধ করে।

ডাক্তার কথা দেন— আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিস নীলা। ওর চিকিৎসা আমি ভালভাবে করবো।

ডাক্তার রোজ দু'বেলা দু'বার আসতে শুরু করে।

নীলা করে ওর সেবা যত্ন।

বনহুর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে।

একদিন বলে বনহুর নীলা তুমি আমার জন্য অনেক করলে তোমার এ ঋন কোনদিন পরিশোধ করতে পারবোনা।

নীলা একটু হেসে বললো— তোমার জন্য যা করছি তা মেয়েদের কর্তব্য। বেশি কিছু করিনি মনির।

বনহুর আর নীলার যখন কথা হচ্ছিলো তখন আড়ালে আত্মগোপন করে দেখছিলো খানসামা হাসান।

নীলা বললো— জানো আজ আমার কত আনন্দ হচ্ছে। তুমি সুস্থ হয়ে উঠেছো এ যে আমার জীবনের বড় পরম সৌভাগ্য। কিন্তু—

বলো থামলে কেন?

বড় ভয় তোমাকে কোন মুহূর্তে দস্যু বনহুর হত্যা করে বসবে কে জানে। কতক্ষণ আমি তোমায় চোখে চোখে রাখবো।

হাসলো বনহুর —নীলা মরণ যখন আসবে তখন কেউ তা রোধ করতে পারবে না। যাক ওসব কথা শোন নীলা আমি ক'দিনের জন্য দেশে যাবো— মানে বাড়িতে। মালিককে বলবে তিনি যেন ছুটি দেন।

তুমি দেশে যাবে মনির।

বিশেষ জরুরি প্রয়োজন, না গেলেই নয়।

সত্যি তুমি গেলে আমার বড্ড খারাপ লাগবে। আবার কবে আসবে তুমি?

অমাবস্যার আগেই চলে আসবো।

ফিরুগাঁও যাবার সময় তুমি থাকবে আমাদের সাথে না হলে আমি যাবো না কিন্তু ফিরুগাঁয়ে।

তুমি না গেলেও তোমার আব্বু তোমাকে ছাড়বে না। তোমাকে নিয়ে যাওয়াই যে তার মূল উদ্দেশ্য।

বনহুরের মনে কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হলো।

নীলা বললো— চুপ করে রইলে কেন?

নিশ্চয়ই আসবো।

সত্যি গিয়ে ভুলে যাবে না তো।

নীলা তোমাকে ভুলতে চাইলেও ভুলবো না তাই আবার আসবো।

বনহুর খান বাহাদুর আমির আলীর কাছে ছুটি নিয়ে চলে গেলেও সে সত্যি সত্যি গেলো না।

বৃদ্ধ ড্রাইভার জিমসীর বেশে সে এ বাড়িতেই রয়ে গেলো। মস্ত দাড়ি গোঁফে ঢাকা মুখ, চোখে চমশা ডিলা পাজামা পাঞ্জাবী পরা। মাথায় পাগড়ী, ডান হাতে বালা, পায়ে নাগড়া জুতা। জিমসী শিখ ড্রাইভার ছিলো।

একদিন জিমসী যখন তার ছোট কুঠুরীটার মধ্যে নিদ্রায় অচেতন ছিলো তখন বনহুর আলগোছে এসে দাঁড়ালো তার বিছানার পাশে।

পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে ওর নাকের সামনে ধরলো। কয়েক সেকেণ্ড তারপর রুমাল খানা পুনরায় পকেটে রাখলো বনহুর।

এবার সেই ড্রাইভার জিমসীর দেহটা তুলে নিলো হাতের উপর। গেটের বাইরে একটি গাড়ি অপেক্ষা করছিলো বনহুর জিমসীকে এনে গাড়ির পিছন আসনে শুইয়ে দেয় তারপর ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলে— রহমান একে শহরের আস্তানায় যত্ন সহকারে রাখবে। তারপর সরে দাঁড়ায় বনহুর!

ড্রাইভার বেশী রহমান বলে—সর্দার আপনার নির্দেশ মতই কাজ করবো।

গাড়ি দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়।

বনহুর ফিরে আসে জিমসীর কামরায়।

ছোট আয়না খানার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বনহুর নিজের চেহারাটা সম্পূর্ণ পাল্‌টে নেয়। লম্বা দাড়ি গোঁফ তাও আবার সাদা ধব ধবে। চোখে চশমা, ডান হাতে বালা। মাথায় পাগড়ী, ডিলা পাজামা আর পাঞ্জাবী। চোখের নীচে একটু কালিমা একটা বয়সের ছাপ।

দিব্য আরামে ঘুমায় বনহুর ভোর পর্যন্ত।

সকালে খানসামা হাসান এসে তাকে জাগিয়ে দেয়— এই এবার উঠো। গাড়ি বের করবে কখন আজ যে রংলাল নেই।

হাই তুলে উঠে বসে জিমসী।

কদিন থেকে বনহুর জিমসীকে সর্বক্ষণ লক্ষ্য করে এসেছিলো। কি তার অভ্যাস, কেমন তার কণ্ঠস্বর, কেমন তার চলাফেরা এমন কি জিমসী কি খেতে ভালোবাসে তাও সে ভালভাবে দেখে নিয়েছিলো। কারণ বনহুর বুঝতে পেরেছিলো রংলালের বেশে এ বাড়িতে তার অবস্থান কাল শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু এখনও তার কাজ শেষ হয়নি। আরও বুঝতে পেরেছিলো রংলালকে হত্যার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছে একটা দল, তারা অন্য কেউ নয় জঙ্গল বাড়ি ঘাটির মালিক হামবার্টের।

সেদিন নীলা যদি ডাক্তারের চক্রান্ত বুঝতে না পারতো তা হলে ঐদিন ডাক্তার স্মিথ বিষাক্ত ইনজেকশন দ্বারা চির নিদ্রায় অচেতন করে ফেলতো রংলালকে। আর কোনদিন সে চোখ মেলে তাকাতো না। তাই রংলাল ছুটি নিলো শত্রুর চোখ থেকে আত্নগোপন করার জন্য।

এখানে আসার পর বনহুর কান্দাই জঙ্গল আস্তানায় যাবার সুযোগ করে উঠতে পারেনি কিন্তু প্রায়ই সে গভীর রাতে কান্দাই তার শহরের আস্তানায় গিয়েছে। ওয়্যারলেছে রহমানের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছে।

তার ছদ্নবেশের সরঞ্জামও বনহুর শহরের আস্তানা থেকেই সংগ্রহ করেছিলো।

বনহুর উঠে বসে চোখ রগড়ে বলে—হাসান ভাই তুমি একটু আরাম করে ঘুমাতে দেবেনা দেখছি।

আরাম, আরাম—আর কত আরাম করবে শিখজ্বি। দেখছোনা কোথাকার আপদ এসে জুড়ে বসেছে। মালিক আর মালিকের মেয়েকে দখল করে নিয়েছে—বেটা যেন রাজ্য জয় করে নিয়েছে একেবারে! আর দুটো দিন থাকলে ওকে শেষ করে দিতাম।

দু'চোখ কাপালে তুলে বলে জিমসী—আর দু'টো দিন থাকলে তাকে শেষ করে দিতে মানে খতম করে দিতে?

হাঁ শিখজী হাঁ।

বলো কি হাসান!

রংলালকে পরপারে পাঠাতে পারলে আমার মোটা বখশীস মিলবে। শোন শিখজী খবরদার এসব কথা কারো কাছে বলবেনা।

দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে বলে জিমসী—হাসান ভাই এক সঙ্গে কত দিন ধরে কাজ করছি আজও আমাকে বিশ্বাস করতে পারলে না? তুমি বখশীস পেলে আমাকে কি খাওয়াবে হাসান ভাই বলো না।

তোমাকে খৈনি কিনে দেবো এক কৌটা......খুব করে ঠোঁটে লাগাবে।

মিষ্টি-উষ্টি খাওয়াবে না হাসান ভাই?

আগে কাজ হাসিল করি......

কিন্তু তোমার শিকার তো ভেগেছে।

যাবে কোথায়। যে মধুর সন্ধান সে পেয়েছে এতো সহজে সরে পড়বে বলে মনে হয় না। দশ দিনের ছুটি নিয়ে গেছে চারদিন যেতে না যেতেই বেটা এসে পড়বে। তখন ওর একদিন না আমার একদিন দেখে নেবো! মেম সাহেব কিন্তু বড্ড খেয়ালী হয়ে উঠেছে এই যা একটু কষ্ট হবে আমার।

তার মানে?

মানে রংলালকে সব সময় মেম সাহেব আগলে থাকে, যেন কেউ তাকে ছিনিয়ে নেবে তার কাছ থেকে।

তা তো ঠিকই হাসান ভাই তুমি যে ভাবে রংলালকে হত্যা করার ব্রত নিয়েছো তাতে মেম সাহেব খেয়াল না রাখলে কবে রংলাল পাতালপুরিতে গিয়ে হাজির হতো মানে কবরে গিয়ে......বুঝলে তো?

তা আর বুঝিনি কিন্তু এবার এলে হয়। মেম সাহেবের চোখে কেমন করে ধুলো দিতে হয় জানি। হামবার্ট সাহেব এবার এমন একটা ঔষধ দিয়েছে যা খাবার সঙ্গে সঙ্গে সে বোবা বনে যাবে। একটি কথা আর সে বলতে পারবে না বা তার কোন স্মৃতি শক্তি থাকবে না।

জিমসীর মুখ খানা হাসিতে ভরে উঠে—বাঃ বাঃ খুব ভাল ঔষধ তো। ঔষধটা তুমি পেয়ে গেছো এতো তাড়াতাড়ি?

হাঁ। জঙ্গল বাড়ি থেকে লোক এসেছিলো এই ঔষধটা নিয়ে কিন্তু তার আগেই রংলাল ছুটি নিয়ে চলে গেছে। না হলে বেটাকে আমি বোবা আর পাগল করে ছাড়তাম না।

যাক এসব কথা যখন তখন যেখানে সেখানে বলা ঠিক নয় হাসান ভাই। তুমি এখন কাজে যাও আমি গাড়ি বের করিগে। মেম সাহেব আবার কোথায় যান কে জানে।

হাসান বলে—আমি কাউকে ভয় করিনা জিমসী। শুধু ভয় পাই মেম সাহেবকে। আজকাল মেম সাহেব আমার দিকে কেমন সন্দেহ নিয়ে তাকায়। আমি রংলালকে কোন খাবার এনে দিলে খেতে দেয় না। মেম সাহেব নিজে হাতে খাবার এনে দেয়......

তাহলে তো মুস্কিল। রংলালের সংগে যে ভাবে মেম সাহেব লেগে আছে তাতে তোমার কাজ সমাধা হবে বলে মনে হয় না।

আমি এবার চালাক হয়ে গেছি শিখজী।

তাই নাকি?

হাঁ।

একটু বলবে না হাসান ভাই আমাকে?

শিখজী আমি তোমাকে সব চেয়ে বেশি বিশ্বাস করি। কারণ এ বাড়িতে যত চাকর বাকর আর খানসামা ড্রাইভার এসেছে সবার মধ্যে আমরাই পুরোন। সবাই এসেছে আর গেছে তুমি আর আমি শুধু টিকে আছি। তাই তো আমি তোমার কাছে মনের কথা বলি।

আচ্ছা তা হলে তুমি বলতে পারো হাসান ভাই রংলালকে হত্যা করার নতুন ঔষধটা কি?

হত্যা নয় বোবা আর স্মৃতি বিকৃতি হবে তার।

মানে উন্মাদ হয়ে যাবে এই তো?

হাঁ।

কি ঔষধ আর কি ভাবে তাকে খাওয়াবে?

চমৎকার একটা বুদ্ধি আবিষ্কার করেছি। সাবধান এ কথা ঘুণাক্ষরেও বলবে না কাউকে।

না-না-না এই নাক কান মলে বলছি বলবো না।

বেশ শোন। পকেট থেকে একটা ছোট শিশি বের করে বলে এই সেই হীরক চূর্ণ......

হীরক চূর্ণ।

হাঁ হীরক চূর্ণ এর নাম। অতি ভয়ঙ্কর সাংঘাতিক ঔষধ।

বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে দেখে জিমসী ঔষধের শিশিটা।

হাসান চোখ মুখ বিস্ফারিত করে বলে—এ গুড়ো শুকনো গেলাসে ছড়িয়ে দিয়ে রাখবো। মেম সাহেব যখন নিজের হাতের শূন্য গেলাসে পানি বা দুধ এনে রংলালকে খেতে দেবে তারপর বুঝলে শিখজী? শুকনো গেলাস বা কাপে এই হীরক চূর্ণ দিলে একটুও বোঝা যাবে না।

শিখজী শুধু একটা শব্দ করলো মাত্র।

হাসান বললো—এ ঔষধ আমি কোন সময় কাছ ছাড়া করিনা। রংলালকে বোবা আর উন্মাদ বানাতে পারলে আমি আর খানসামা থাকবো না।

দেখো হাসান ভাই আমাকে ভুলে যেওনা তখন।

না-না ভুলবোনা। যাও তুমি এবার গাড়ি বের করোগে। চলে যায় হাসান মিয়া।

জিমসী এগিয়ে যায় গ্যারেজের দিকে।

গাড়ি বের করে পরিষ্কার করতে থাকে ব্রাস দিয়ে।

বেলা বাড়ছে।

গাড়ি পরিষ্কার হলো।

তবু গাড়ির পাশে কেউ এলোনা। কারো যেন প্রতিক্ষা করে জিমসী। বারবার তাকায় সে বাসার দিকে।

সমস্ত দিন জিমসী কোন কাজ পায় না। কেমন যেন অসহ্য লাগছে আজ ওর। গাড়ি চালানো ছাড়া আর কিই বা কাজ আছে তার। সারাদিন বসে বসে খৈনি ডলা আর ঠোটের নিচে দেওয়া এইতো ওর কাজ।

এক সময় জিমসী নীলার ঘরে গিয়ে হাজির হয়।

নীলা এলোমেলোভাবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিলো।

জিমসীর পদশব্দে ফিরে তাকায়—তুমি।

হাঁ মেম সাহেব।

কিছু বলবে?

আজ বাইরে যাবেন না মেম সাহেব?

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলে নীলা—না।

সেকি মেম সাহেব রংলাল নেই বলে আপনি বাইরে যাবেন না?

শরীর ভাল লাগছে না।

বাইরে গেলেই ভাল লাগবে মেম সাহেব।

তুমি যাও জিমসী মন ভাল নেই।

তাই বলুন মেম সাহেব। একটু হেসে বেরিয়ে যায় জিমসী।

নীলা দু'দিন বাইরে বের হয়না, সদা বিষণ্ন মন নিয়ে নিজের ঘরে বসে থাকে চুপচাপ। হয় পড়াশোনা করে নয় রেডিওতে গান শোনে।

নীলার এই বিষন্ন ভাব জিমসীর মনকে ভাবিয়ে তেলে। মাঝে মাঝে এটা ওটা নিয়ে নীলার কক্ষে যায় সে কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াবার সুযোগ সে পায়না।

জিমসী হয়তো সকালে এক থোকা রজনী গন্ধা নিয়ে হাজির—মেম সাহেব ফুল।

নীলা অন্যমনস্কভাবে বলে—রেখে যাও ফুলদানীতে।

জিমসী ফুলদানীতে ফুল রেখে বেরিয়ে যায়।

অন্যান্য দিনের মত সেদিনও জিমসী এক থোকা ফুল নিয়ে নীলার ঘরের দিকে যাচ্ছিলো হঠাৎ তার কানে ভেসে এলো খানসামা হাসানের গলা, চাপা কণ্ঠে কথা বলছে সে......মালিক সব ঠিক করে রেখেছি, রংলাল ফিরে এলেই আমি তাকে হীরক চূর্ণ খাওয়াবো......হাঁ কেউ টের পাবে না......শিশিটা সব সময় আমার সংগে সংগে রেখেছি— —না মেম সাহেব এ ক'দিন বাইরে যায়নি— —আমি খেয়াল রেখেছি তার উপর— —মালিক বখশীসটা আমার— —আচ্ছা—আচ্ছা—

হঠাৎ কাধে স্পর্শ অনুভব করে হাসান, চমকে ফিরে তাকায়—আরে জিমসী তুমি। আমি তো ভীষণভাবে ভড়কে গিয়েছিলাম।

আরে না না আমি ছাড়া আর কে তোমার এমন দোস্ত আছে বলো। সত্যি হাসান ভাই তোমার মত ভাল মানুষ হয়না। দেখো ভাই আমি বুড়ো মানুষ

আজ আছি কাল নাই। তুমি তো আমার ছোট ভাই এর মত আমাকে বিশ্বাস করবে কেমন!

তা আর বলতে হবে না। আচ্ছা ভাই ওটা কি? জিমসী হাসানের হাতের মুঠায় ছোট ওয়্যারলেস যন্ত্রটা দেখিয়ে বলে।

ও তুমি বুঝবে না জিমসী।

তবু বলোনা একটু। তুমি কার সংগে কথা বলছিলে?

এটা ক্ষুদে ওয়্যারলেস যন্ত্র। কথা বলছিলাম—আমাদের জঙ্গল বাড়ি ঘাটির মালিকের সঙ্গে।

সত্যি?

হাঁ সত্যি না তো কি।

হাসান ভাই আমার বড্ড জঙ্গল বাড়ি ঘাটিতে যেতে ইচ্ছা করে। নিয়ে যাবে একবার আমাকে?

পাগল আর কি। জঙ্গল বাড়ি যাবে তুমি—বন্ধু হাসালে আমাকে। জঙ্গলবাড়ি ঘাটিতে যে একবার গিয়েছে সে আর কোনদিন ফিরে আসেনি।

দু চোখ কাপালে তুলে বলে জিমসী—তার মানে?

মানে আজও আমি জঙ্গলবাড়ি ঘাটি চোখে দেখিনি। আমাদের দলের লোক কেউ দেখেনি।

তবে কাজ করো কি করে?

আমাদের দলের সবার কাছে এমনি একটি করে ক্ষুদে ওয়্যারলেস আছে যার মধ্যে আমরা কাজের নির্দেশ পাই যে কি ভাবে আমরা কাজ করবো। হাঁ একদিন জঙ্গলবাড়ি ঘাটিতে যাক পড়ে, মৃত্যুদণ্ডাদেশ যেদিন হয়।

সর্বনাশ আমি চাইনা অমন ঘাটি দেখতে......কাঁপতে শুরু করে জিমসী।

হাসে খানসামা হাসান—এই সাহস নিয়ে চাও জঙ্গল বাড়ি ঘাটি দেখতে!

যা হোক ভাই আমি ও সবের মধ্যে নাই। ড্রাইভারী করি দিব্য আরামে নাক ডেকে ঘুমাই......বুড়ো হয়েছি কবে মরবো ঠিক নাই। বেরিয়ে যায় জিমসী।

ফুল হাতে নীলার ঘরে প্রবেশ করতেই চমকে উঠে জিমসী। নীলা বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

জিমসী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। ওর চোখ দুটো কেমন ছলছল হয়ে উঠলো। নীলার ব্যাথাটা তার হৃদয় স্পর্শ করলো, পারলোনা সে নিজকে স্থির রাখতে এগিয়ে এসে নীলার পিঠে হাত রাখলো—মেম সাহেব।

নীলা আরও বেশি করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

জিমসী বললো—কি হয়েছে মেম সাহেব? আজ ক'দিন থেকে আপনাকে বড্ড অসুস্থ মনে হচ্ছে।

তুমি বুঝবে না জিমসী বাবা, তুমি বুঝবে না।

নীলা জিমসী ড্রাইভারকে জিমসী বাবা বলে ডাকতো। কারণ সে তাকে ছোট বেলা থেকে দেখে আসছে। ওর কোলে কাঁধে চেপে কত খেলা করেছে নীলা। জিমসী ওকে অনেক স্নেহ করে।

নীলা সোজা হয়ে বসে আঁচলে চোখ মুছে বলে—জিমসী বাবা তুমি আমাকে কত ভালবাসো। তুমি রংলালকে ভালবাসো?

হাঁ বড় ভাল ছেলে তাই আমিও ভালবাসি। কিন্তু ছেলেটা গেলো আর এলোনা কেনো?

আসবে বলে গেলো, জানিনা আর আসবে কিনা.......বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে ওর গলা!

জিমসী নীলার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বলে—মেম সাহেব সে যদি আর না আসে তাতে কি হবে?

তুমি বুঝবেনা জিমসী বাবা।

জানি মেম সাহেব আপনি তাকে ভাল বেসেছেন কিন্তু আপনি ভুল করেছেন। সে কোথাকার কে কি তার পরিচয় কিচ্ছু আপনি জানেন না। তবু এতো বড় ভুল আপনি কেনো করলেন?

জিমসী বাবা!

জানি তাকে ভুলতে আপানার কষ্ট হবে কিন্তু না ভুলে কোন উপায় নাই।

জিমসী ও কথা তুমি বলোনা। আমার মন বলছে সে আসবে এতো বড় মিথ্যা বলে সে যেতে পারে না।

মেম সাহেব এখনও সময় আছে আপনি তাকে......

নানা ও কথা আর বলোনা জিমসী। বলো না......

আপনি রাজার মেয়ে আর সে কোথাকার কে।

সে আমাদের চেয়ে অনেক বড় জিমসী বাবা তুমি তাকে জানো না। আমি জানি এ পৃথিবীতে যত পুরুষ আছে তার মধ্যে সে অসাধারণ......

এমন সময় আলী সাহেব কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করেন—মা নীলা।

নীলা চোখ মুছে উঠে দাঁড়ায়।

জিমসী সরে দাঁড়ায় এক পাশে। এখনও তার হাতের মুঠায় এক থোকা রজনী গন্ধা।

নীলা কোন কথা বলে না।

আমির আলী সাহেব বলেন—নীলা আর ক'দিন মাত্র বাকি আছে। আমরা ফিরুগাঁও যাবো। তুমি তৈরি থেকো মা।

আচ্ছা আব্বু।

বেরিয়ে যান আমির আলী সাহেব।

জিমসী ফুলগুলো ফুলদানীতে রেখে বেরিয়ে যায়।

কিছুটা এগুতেই জিমসীর নজরে পড়ে আমীর আলী এবং আর একজন অপরিচিত ব্যক্তি কি যেন আলাপ করছে।

জিমসী ইচ্ছা করেই সেই পথে এগিয়ে যায়।

তার কানে ভেসে আসে খানবাহাদুর আমির আলীর কণ্ঠ......না না আমি পারবোনা নীলাকে এভাবে তার হাতে তুলে দিতে...... আমি নীল পাথর চাই......

অপর ব্যক্তির কণ্ঠ......আপনাকে ভেবে দেখার জন্য সময় দিয়েছে ......ভেবে দেখবেন খান বাহাদুর সাহেব......

......ভেবে দেখেছি অমাবস্যার পূর্বে আমি নীলাকে নিয়ে যাবো সত্য কিন্তু পারবো না আমি হামবার্টের হাতে তাকে সমর্পণ করতে... যতক্ষণ না আমার নীল পাথর আমি ফিরে......পেয়েছি......

.......জানেন তার পরিণতি কি হবে?

......জানি আমাকে সে হত্যা করবে।

.......কিন্তু সে হত্যা স্বাভাবিক হত্যা নয় খান বাহাদুর।

এবার চিৎকার করে উঠেন খান বাহাদুর সাহেব—না না আমি তাকে ভয় করিনা। আমার কাছ থেকে সে যথা সর্বস্ব নিয়েছে, ঐ মেয়েটি ছিলো আমার নয়নের মনি তাও তাকে দিতে স্বীকার হয়েছি শুধু নীল পাথরের বিনিময়ে। তুমি ফিরে যাও শিবাজী.....

......হামবার্ট আপনাকে কোটি কোটি টাকা দেয়নি?

......দিয়েছে কিন্তু তার বদলে সে আমার কাছ থেকে নীল পাথর নিয়েছে। যে পাথর ছিলো আমার জীবন......পারবোনা আমি নীলাকে ওর হাতে তুলে দিতে যতক্ষণ না নীল পাথর আমাকে সে দেবে......

......আচ্ছা এ সংবাদ আমি তাকে জানাবো।

......যাও। তাই যাও শিবাজী......

শিবাজী কটমট করে তাকালো একবার আমির আলী সাহেবের মুখের দিকে তারপর দ্রুত চলে গেলো।

জিমসী তাকিয়ে দেখলো ফটকের বাইরে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছে। গাড়িখানায় শিবাজী চেপে বসলো সঙ্গে সঙ্গে উলকা বেগে বেরিয়ে গেলো গাড়িটা।

জিমসী ফিরে এলো তার কক্ষে।

নীলা আর নীল পাথর। এ দু'টো নিয়েই খান বাহাদুর আমির আলী আজ বিপদগ্রস্থ।

হঠাৎ জিমসীর চিন্তা স্রোতে বাধা পড়ে। নীলা এসে দাঁড়িয়েছে তার দরজায়—জিমসী বাবা!

চট করে উঠে দাঁড়ায় জিমসী—মেম সাহেব বলুন?

চলো বাইরে যাবো।

আপনি এসেছেন কষ্ট করে। আমাকে ডাকলেই হাজির হতাম।

নীলা গাড়ির পাশে এগিয়ে যায়।

জিমসী গাড়ির দরজা খুলে ধরে।

নীলা গাড়িতে উঠে বসে।

জিমসী ড্রাইভিং আসনে বসে বলে—কোথায় যেতে হবে মেম সাহেব?

চলো, লেকের ধারে চলো।

গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো জিমসী।

গাড়ি বেগে ছুটে চলেছে।

জনমুখর রাজপথ। পথের দু'পাশে সুউচ্চ অট্টালিকা। মাঝে মাঝে আকাশের কিছু অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। লাইট পোষ্টগুলোর মাথায় আলোগুলো এখনও জ্বলে উঠেনি।

জিমসী নীরবে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে।

একপাশে চুপ চাপ বসে আছে নীলা। গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করছে সে।

সন্ধ্যার একটু আগে লেকের ধারে এসে থামলো গাড়ি খানা।

নেমে পড়লো নীলা।

এগিয়ে গেলো সে যেখানে আর একদিন ওরা বসেছিলো পাশাপাশি। নীলা আর রংলাল।

নীলা নির্বাক নয়নে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সেই জায়গাটার দিকে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো সেদিনের দৃশ্যগুলো। সে আর রংলাল বসে বসে কত কথা বলেছিলো। নৌকায় বসে ওরা দু'জনা কত হাসি আর গানে মেতে উঠেছিলো।

সব আজ নীলার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

জিমসী অদূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে সব কিছু। নীলার গুণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোটা ফোটা অশ্রু।

জিমসী এসে দাঁড়ায় তার পাশে—মেম সাহেব চলুন এবার।

জিমসীর কথায় চমকে উঠে নীলা তাড়াতাড়ি হাতের পিঠে চোখের পানি মুছে বলে—চলো।

গাড়িতে ফিরে আসে নীলা আর জিমসী।
পথে একটি কথাও হয়না নীলার সংগে জিমসীর।
সেই দিন গভীর রাতে বনহুর তার জিমসী ড্রেস পালটে চলে যায় তার আস্তানায়। তার শরীরে তখন ছিলো দস্যু ড্রেস।
রহমানের সংগে কিছুক্ষণ তার নিভৃতে আলাপ হয়।
কান্দাই আস্তানা নিয়ে কথা হলো। বেশ কিছুদিন সে আস্তানা ছেড়ে চলে এসেছে নানা সংবাদ ছিলো তাই রহমান সর্দারের কাছে পেশ করলো।
আজ রাতে জিমসীকে তার বাসগৃহে রেখে আসার জন্য নির্দেশ দিলো বনহুর।
এখানে জিমসীকে অতি যত্ন সহকারে রাখা হয়েছিলো। সুন্দর পরিচ্ছন্ন ঘর। কোমল দুগ্ধ ফেনিল শয্যা। জিমসী যখন ঘুম থেকে উঠে তখন তার সম্মুখে নানাবিধ খ্যাদ্য সম্ভার এসে হাজির হতো। ফলমূল আর সুস্বাদু পানিয়। জিমসী ভেবে পায় না সে ঘুমের ঘোরে কোথায় কোন স্বপ্ন রাজ্যে চলে এসেছে। মাঝে মাঝে জিমসী শরীরে চিমটি কেটে দেখে জেগে আছে না ঘুমিয়ে আছে সে।
রাজা রাজরার মত এতো খানাপিনা সে কোনদিন খায়নি। এমন সুখও সে পায়নি কোনদিন। সব সময় তার আদেশ পালনে দু'জন দাঁড়িয়ে থাকতো দু'পাশে। জিমসীর খৈনি প্রিয় জিনিস তাই ভাল খৈনি সব সময় রাখা হতো তার পাশে।
জিমসীর মত এতো আরামে কেউ বুঝি থাকেনা। ভোরে ঘুম ভাংতেই জিমসী চোখ বন্ধ করেই বললো—আজ পরোটা আর মুরগীর কারাব খাবো!
কিন্তু কই কারো পদশব্দ শোনা গেলোনা।
চোখ খুললো জিমসী, কিন্তু একি এখন সে কোথায়। তার দুগ্ধ ফেনিল বিছানাই বা গেলো কোন খানে। দড়ির শক্ত খাটিয়ায় কম্বলে সে শুয়ে আছে।
চিৎকার করে ডাকলো—এই তোমরা সব গেলে কোথায়? আমার খানা কই.......আমার খানা.....তবু কেউ এলোনা।
আরও চিৎকার শুরু করলো জিমসী।
চাকর বাকর আর খানসামা দারোয়ান সবাই ছুটে এলো ব্যাপার কি।
জিমসী তখনও বলে চলেছে—এই তোমরা হা করে দেখছো কি? আমার খাবার নিয়ে এসো।
সবাই তো অবাক, জিমসী বলে কি।
জিমসী তখনও বলে চলেছে—আমার বিছানা কোথায় গেলো। একি বিশ্রি বিছানা তোমরা আমাকে দিয়েছো? এই এতোক্ষণও আমার খাবার আনছো না কেনো! হা করে কি দেখছো তোমরা......

জিমসীর কথাবার্তা শুনে সবাইতো অবাক। হেসে উঠলো তারা। বললো, জিমসী পাগল হয়ে গেছে। খবর নিয়ে ছুটলো ওরা খান বাহাদুর আমির আলীর কাছে।

হাসান মিয়াই এসে জানালো প্রথম—মালিক শিখজী পাগল হয়ে গেছে।

জিমসী পাগল হয়ে গেছে।

আমির আলী সাহেব ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটে এলেন, সত্যিই জিমসী আবোল তাবোল বকছে।

সংবাদটা নীলার কানেও পৌঁছলো।

নীলা তো বিস্মিত হতবাক। কাল সন্ধ্যা বেলাই জিমসী নিজে তাকে ড্রাইভ করে নিয়ে গিয়েছিল লেকের ধারে। একটি রাতের মধ্যেই জিমসী পাগল হয়ে গেলো।

নীলা নিজে গেলো জিমসী বাবাকে দেখতে। একেই তার মনের অবস্থা ভালো ছিলো না তারপর জিমসী বাবার এই অবস্থা।

জিমসীর জন্য ডাক্তার স্মিথ এলেন। ওকে পরীক্ষা করে বললেন—জিমসীর মাথা খারাপ হয়েছে।

সেইভাবে চিকিৎসা শুরু হলো।

এমন সময় রংলাল এসে হাজির।

আমির আলী সাহেব ওকে দেখে খুশি হলেন, তিনি বলেই বসলেন—আজ এসে খুব ভালো করেছো রংলাল। জানো জিমসী পাগল হয়ে গেছে।

অবাক হয়ে বলে রংলাল মালিক সে জন্য আমি দুঃখ পাচ্ছি কারণ জিমসী ছিলো অত্যন্ত ভালো মানুষ।

নীলা দূর থেকে রংলালকে দেখলো। দীপ্ত হয় উঠলো তার নীল চোখ দুটো। ইচ্ছা থাকলেও পারলো না সে ছুটে যেতে। নিজের ঘরে এসে মুক্ত জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো যেখানে থেকে রংলালকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো।

রংলালের আগমনে খান বাহাদুর আমির আলির বাড়ির কারো মনে কোন প্রতিক্রিয়া শুরু না হলেও খানসামা হাসান মিয়ার মনে ভীষণ আলোড়ন শুরু হলো।

হাসান আড়ালে আত্মগোপন করে ওকে তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করতে লাগলো। কোমরে হাত দিয়ে হীরক চুর্ণের শিশিটা দেখে নিলো সে একবার।

রংলাল এসেছে এযে নীলার কাছে কত আনন্দের কথা আর কেউ তা বুঝবে না। নীলা উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতিক্ষা করতে লাগলো সেই মুহূর্তটির যে সময়টিতে তাকে পাশে পাবে সে।

রংলাল তার ঘরে জামা কাপড়গুলো গুছিয়ে রাখছিলো।

এমন সময় নীলা এসে দাঁড়ায় তার পিছনে—মনির।
ফিরে তাকায় রংলাল—কে আপামনি।
হাসে নীলা।
রংলাল এগিয়ে এসে—নীলা কেমন ছিলে?
মুখমণ্ডল বিষণ্ন করে এরপর বলে নীলা—দশদিনের কথাবলে চলে গেলে এলে তো পনেরো দিন পর।
ভেবেছিলে আর আসবো না!
নীলা মাথা দুলিয়ে বলে—হাঁ।
যদি সত্যি না আসতাম?
নীলাকে কেউ খুঁজে পেতো না। ......
নীলা!
হাঁ মনির!
এ তুমি কি বলছো নীলা? ধীরে ধীরে বনহুর গম্ভীর হয়ে পড়ে। তামাসার ছলে ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়ে গেছে এই মুহূর্তে তা ভালোভাবে উপলব্ধি করে সে। নীলাকে এখন ফেরাবার উপায় কি—ভাবে বনহুর।
নীলা ওকে গম্ভীর হতে দেখে সরে আসে—কি হলো তোমার মনির!
বনহুর কোন কথা বলেনা, মুক্ত জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তাকায় সে সীমাহীন আকাশের দিকে। আজ নতুন করে নীলার আর একটা দিক তাকে অস্থির করে তোলে। বারবার নীলার একটি কথা কানের কাছে প্রতিধ্বনি জাগায়—যদি সত্যি না আসতাম......নীলাকে কেউ খুঁজে পেতো না...নীলাকে কেউ খুঁজে পেতো না...
নীলা এগিয়ে এসে বনহুরের পিঠে মাথা রেখে বলে—কি হলো কথা বলছো না কেনো? সত্যি কথা বলবে না।
বনহুর বলে—নীলা তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।
বেশ বলো।
ঠিক ঐ মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করে হাসান, ট্রে'র উপরে কয়েকটা বিস্কুট এবং চায়ের সরঞ্জাম।
রেখে বেরিয়ে যায় হাসান।
নীলা বলে—আমি তোমায় চা বানিয়ে দিচ্ছি।
বনহুর কোন কথা বলে না।
নীলা চা তৈরি করে বাড়িয়ে ধরে—নাও।
বনহুর চায়ের কাপ হাতে নেয় কিন্তু চায়ের কাপে সে চুমুক দেয় না। উঠে দাঁড়িয়ে বলে—এসো নীলা। দুটো বিস্কুটও সে তুলে নেয় হাতে।
নীলা বিস্ময় নিয়ে তাকায়।

বনহুর উঠে দাঁড়ায়ে বলে—আমার সঙ্গে এসো।

নীলা বনহুরকে অনুসরণ করে।

বনহুর চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে। নীলা তার পিছনে এসে দাঁড়ায়।

অদূরে একটি কুকুর দাঁড়িয়েছিলো বনহুর তার হাতের বিস্কুট আর চা ঢেলে দেয় কুকুরটার সামনে!

কুকুরটা খেতে শুরু করলো।

বনহুর আর নীলা দাঁড়িয়ে আছে স্থির ভাবে।

কুকুরটা বিস্কুট এবং চা টুকু খাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে উঠলো তারপর পড়ে গেলো মাটিতে। মাথাটা বার দুই আছাড় দিয়ে নীরব হয়ে গেলো।

নীলার দু'চোখ কপালে উঠেছে। সে হতবাক হয়ে তাকায় রংলালের মুখে তারপর দু'হাতে ওর জামার আস্তিন চেপে ধরে বলে উঠে—কি সর্বনাশ। হাসান বিষ মিশিয়ে এনেছিলো আমি জানতাম না মনির!

ফিরে এলো বনহুর আর নীলা ঘরে।

নীলার দু'চোখে রাগ ঝরে পড়ছে। সে বললো আমি এই মুহূর্তে ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবো। আব্বুকে সব কথা বলবো আমি।

না না আব্বুকে কিছু বলতে যেওনা নীলা আর হাসানকে তাড়িয়ে দিলেও সে আমার পিছু ছাড়বে না। আমাকে হত্যা না করা পর্যন্ত ওর স্বস্তি নাই।

মনির!

হাঁ নীলা, সেই কারণে আমি এখানে না থাকাই শ্রেয় বলে মনে করি তাছাড়া তোমারও বিপদ আসতে পারে।

আমার জন্য একটুও ভাবি না মনির যত ভাবনা তোমাকে নিয়ে। বলো কি বলবে বলেছিলে।

আজ নয়, বলবো যেদিন বলার সময় আসবে।

নীলা বলে—আমি সেদিনের জন্য অপেক্ষা করবো।

❑

একদিন খানসামা হাসান উধাও।

আমির আলী সাহেব ওর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। শুধু তিনি নন, বাড়ির সবাই এমন কি নীলাও বিস্মিত অবাক লোকটা গেলো কোথায়।

বনহুর নিজেও আশ্চর্য হলো এভাবে সে উঠে যাবে ভাবতে পারেনি।

এখানে যখন হাসানকে নিয়ে খোঁজা খুঁজি চলেছে তখন জঙ্গল বাড়ির ঘাটিতে হাসানকে পিছ মোড়া করে বাঁধা অবস্থায় গরম লৌহ শলাকা দিয়ে শেক দেওয়া হচ্ছে।

সম্মুখে দন্ডায়মান চন্ডাল হামবার্ট চাটার্যি। দু'চোখ তার অগ্নিবর্ণ। দাঁত মুখ খিঁচে বলে উঠে, একটা সামান্য কাজ তোমার দ্বারা সমাধা হলো না। অপদার্থ কোথাকার। হীরক চূর্ণ দিয়েও তুমি ওকে হত্যা করতে সক্ষম হলে না।

সমস্ত দেহ ক্ষত বিক্ষত, হাঁউ মাঁউ করে কেঁদে উঠে হাসান—আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি মালিক কিন্তু...

তোর জিভ ছিড়ে ফেলবো—গর্জে উঠে হামবার্ট।

সঙ্গে সঙ্গে একটি লৌহ শলাকা তুলে নেয় সম্মুখের অগ্নিকুন্ড থেকে।

হাসানের চোখ দু'টো গোলাকার হয়ে উঠে। চিৎকার করে উঠে—মালিক—মালিক......

কিন্তু কে শুনবে তার করুণ চিৎকার। হামবার্টের হাতের অগ্নি দগ্ধ শালাকা এসে বিদ্ধ হয় হাসানের বুকে।

সাঁ—সাঁ করে একটা শব্দ হয় সঙ্গে সঙ্গে একটা ধুম্রশিখা বেরিয়ে আসে লৌহ শলাকার মুখ থেকে। তার সঙ্গে হাসানের মৃত্যু ভয়ঙ্কর আর্তনাদ।

হামবার্ট এবার অগ্নি দগ্ধ শলাকাটা এক টানে বের করে নেয় অমনি হাসানের মাথাটা ঝুলে পড়ে এক পাশে। একটা থামের সঙ্গে তার দেহটা বাধা থাকায় হাসান পড়ে গেলো না।

হামবার্ট মুখে একটা শব্দ করলো অমনি দু'জন বলিষ্ঠ লোক হাসানের প্রাণহীন দেহটা নামিয়ে নিলো থাম থেকে।

পরদিন।

সকালে আমির আলী সাহেব সবেমাত্র তাঁর হলঘরের বারেন্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন এমন সময় তার পুরোন চাকর একটা ঝুড়ি এনে রাখলো আমির আলী সাহেবের সম্মুখে—মালিক এ ঝুড়িটা একটি লোক দিয়ে গেলো। এর মধ্যে নাকি ফল আছে।

আমির আলী সাহেব খুশি হয়ে বললেন—যাও নাস্তার টেবিলে রাখোগে।

চাকরটি ঝুড়ি নিয়ে ভিতর বাড়িতে চলে গেলো।

বাবুর্চি সকালের নাস্তা টেবিলে সাজিয়ে প্রতিদিনের মত ডাকলো—মালিক টেবিলে নাস্তা দেওয়া হয়েছে।

আমির আলী সাহেব নীলাসহ টেবিলে এসে বসলো।

আজ রংলাল আছে পরিবেশনায়।

পিতার সম্মুখে নীলাও ওকে নাস্তার টেবিলে বসার জন্য অনুরোধ করতে সাহসী হয় না। অবশ্য নীলা এজন্য মনে মনে লজ্জিত দুঃখিত ব্যথিত! সে অন্য সময় এগিয়ে বলে—মনির তোমাকে আজও সব কাজ করতে হবে সে জন্য আমি অনুতপ্ত।

হেসে বলে রংলাল, আমি কিন্তু মোটেই এ জন্য দুঃখিত নই নীলা। এছাড়া আমি করবোই বা কি তোমাদের এখানে। খাবার সময় পরিবেশনা আর বাইরে যাবার সময় গাড়ি চালনা এই তো আমার কাজ। মালিক মাসে দু'শো টাকা দেন......

নীলা হেসে ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিলো ওসব বলে আমাকে লজ্জা দিওনা মনির। তুমি হাজার হাজার টাকা বিলিয়ে দাও গরিব দুঃখিদের মধ্যে আর তুমি আব্বুর কাছে দু'শো টাকা মাইনের চাকরি করো.......

নীলার কথায় ও হেসেছিলো শুধু, কোন জবাব দেয়নি।

রংলাল নাস্তার প্লেটগুলি এগিয়ে দিচ্ছে অপর একজন বয় ঝুড়ি খুলে সবে মাত্র ফল মূল বের করতে যায়। ডাক্না খুলতেই চিৎকার করে উঠে বয়—উঃ........সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ে সে ভূতলে।

আমির আলী সাহেব এবং নীলা বিস্ময়ে উঠে দাঁড়াল।

রংলাল বেশী বনহুর তাকায় বয়টার মুখে।

বয় বলে উঠে—মালিক ঝুড়ির মধ্যে দেখুন। ঝুড়ির মধ্যে....

আমির আলী সাহেব তাড়াতাড়ি এগিয়ে ঝুকে পড়লেন এবং অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—ছিন্ন মস্তক...

নীলা পিতার সঙ্গে তাকিয়েছিলো ঝুড়িটার মধ্যে সে একটা তীব্র আর্তনাদ করে টলে পড়ে যাচ্ছিলো।

কিন্তু রংলাল তাকে ধরে ফেললো।

নীলার সংজ্ঞাহীন দেহটা রংলাল হাতের উপর তুলে নিয়ে একটা সোফায় শুইয়ে দিলো।

ফিরে এলো সে ঝুড়িটার পাশে।

ভাল করে লক্ষ্য করতেই রংলাল বেশী বনহুরের চোখ দু'টো বিস্ময়ে ভরে উঠলো কিন্তু সে একেবারে হতবাক হলোনা কারণ সে জানতো হাসানের এমনি একটা পরিণতি হবে। ঝুড়ি থেকে একটা দ্বিখণ্ডিত মস্তক সে তুলে রাখলো টেবিলে।

সবাই তাকিয়ে দেখলো খানসামা হাসানের মাথা।

একটি চিঠি ঝুলছে মাথাটার সংগে।

আমির আলী সাহেব চিঠিখানা কম্পিত হাতে তুলে নিলো। মেলে ধরলো চোখের সামনে. চিঠিতে লিখা আছে মাত্র কয়েকটি শব্দ—

খান বাহাদুর, আমার আদেশ যদি
অমান্য করো তাহলে তোমার
অবস্থা হাসানের মতো হবে। হামবার্ট—

আমির আলী সাহেব মূর্ছা খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলো তাড়াতাড়ি তাকে ধরে বসিয়ে দিলো রংলাল!

ততক্ষণে লোকজন সবাই এসে জোড়া হয়েছে।

কেউ কেউ পুলিশে সংবাদ দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

আমির আলী সাহেব বলে উঠলেন—না, পুলিশ জানানোর কোন দরকার নেই।

মালিকের কথা কেউ অমান্য করতে পারেনা সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করে ক্ষান্ত হয়ে যায়।

রংলাল সেই ফাঁকে বেরিয়ে যায়।

নীলার তখনও সংজ্ঞা ফিরে আসেনি, রংলাল এসে গেলাসে খানিকটা পানি নিয়ে ছড়িয়ে দিলো ওর চোখে মুখে।

একটু পরে জ্ঞান ফিরে এলো নীলার। চোখ মেলে সে তাকিয়ে বললো—একি দেখলাম......একি দেখলাম আমি......

বনহুর ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বললো—ও কিছু না নীলা।

ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো নীলা—আমি যা দেখলাম তা সত্য নয়? সেই ছিন্ন রক্তাক্ত মস্তক।

স্থির হয়ে সব শোন নীলা। যে ছিন্ন মস্তক তুমি দেখেছো তা খানসামা হাসানের।

খানসামা হাসানের মাথা ওটা?

হাঁ।

নীলা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর বলে—নীলা তোমার আব্বুর ও এই অবস্থা হবে।

মনির। আর্তনাদ করে উঠে নীলা।

হাঁ কারণ তুমি পরে সব জানতে পারবে নীলা।

এ তুমি কি বলছো?

সত্যি কথা নীলা তোমার আব্বু যে চক্রান্তের সংগে জড়িয়ে পড়েছেন তা থেকে তিনি মুক্ত হতে পারবেন না।

আমি কিছু বুঝতে পারছিনা মনির।

এখন তুমি অভিশপ্ত অবস্থায় রয়েছো কাজেই কিছু বুঝতে পারবে না।

সমস্ত দিন নীলা আর খেলোনা বা সে বাইরে বের হলোনা। সব সময় নিজের বিছানায় শুয়ে রইলো।

খান বাহাদুর সাহেবও কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেছেন। তার ল্যাবরেটরিতে তিনি সেই যে ঢুকলেন আর বের হবার কথা নাই।

বনহুর সব লক্ষ্য করছিলো!

খান বাহাদুর সাহেব যখন তার গবেষণাগারে প্রবেশ করলেন তখন বনহুর দূর থেকে সব খেয়াল করলো, সেও রংলালের বেশে খান বাহাদুরকে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে গেলো।

গবেষণাগারে প্রবেশ করে দেখলো বনহুর খান বাহাদুর আমির আলী সাহেব গবেষণাগারে নেই। তিনি কোথায় উধাও হলেন ভেবে পেলোনা রংলাল বেশী বনহুর।

সে যখন এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে তখন হঠাৎ সেই অদ্ভুত লাল আলোটা জ্বলে উঠলো।

বনহুর তৎক্ষণাৎ এগিয়ে গিয়ে ওপাশের সুইচটা টিপে ধরলো। সংগে সংগে একটা গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। এ সেই কণ্ঠ...... খান বাহাদুর তোমার উপঢৌকন পেয়েছোঁ......হুঁসিয়ার আগামী অমাবস্যার কথা ভুলে যেওনা যেন......

বনহুর নিজের গলার স্বরকে যত দূর সম্ভব খান বাহাদুর আমির আলীর মত করে বললো......আপনার আদেশ আমার স্মরণ আছে.... আগামী অমাবস্যার জন্য আমিও প্রস্তুত আছি......

......প্রস্তুত......

......হাঁ প্রস্তুতই বটে কারণ আপনিও আমার জন্য অপেক্ষা করবেন......

লাল আলোটা দপ করে নিভে গেলো।

বনহুর সুইচ ছেড়ে দিয়ে সরে এলো গবেষণাগারের মেঝেতে চারিদিকে নানা রকম যন্ত্রপাতি সাজানো। টেবিলে ছোট বড় নানা বর্ণের শিশি এবং কাঁচ পাত্র।

বনহুর তীক্ষ্ণ নজরে সব লক্ষ্য করছিলো।

হঠাৎ পিছনে এসে দাঁড়ালো খান বাহাদুর সাহেব—রংলাল তুমি।

মালিক আপনার খোজে এসেছিলাম।

তোমাকে একবার বলেছি আমার গবেষণাগারে ঢুকবে না।

মালিক আমার মনে ছিলো না। এই শপথ করছি আর আসবো না।

হাঁ যাও।

আপনি যাবেন না মালিক? সমস্ত দিন নীলা আপামনি কিছু মুখে দেননি......

সেকি নীলা কিছু খায়নি?

না মালিক।

আচ্ছা চলো দেখছি।

বেরিয়ে এলেন খান বাহাদুর সাহেব।

রংলাল তাকে অনুসরণ করলো।

নীলার কক্ষে ঢুকে বললেন আমির আলী সাহেব—মা নীলা তুমি নাকি সমস্ত দিন কিছু খাওনি?

নীলা নীরব।

তিনি পুনরায় বলেন—কি হলো তোমার নীলা? যা দেখেছো সকালে যা দেখেছো। তা কিছু নয়! কেউ হাসানকে হত্যা করে ওর মাথাটা কেটে আমাকে দেখাবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। তুমি কিছু ভেবোনা বা এসব নিয়ে চিন্তা করো না।

নীলা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো তার আব্বুর মুখের দিকে।

আমির আলী সাহেব বয়কে নির্দেশ দিলেন—নীলার জন্য খাবার এখানে নিয়ে এসো।

খাবার এলো। কিন্তু নীলা নীরব।

রংলাল এসে দাঁড়ালো—আপামনি খেয়ে নিন।

না আমি খেতে পারবো না।

সেকি না খেয়ে মারা পড়বেন যে আপামনি।

আমির আলী সাহেবও ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—নীলা খেয়ে নাও মা না হলে আমিও খাবো না, খাও বলছি...

তুমি খাও আব্বু আমি খাবো।

সত্যি খাবে তো মা!

হাঁ খাবো আব্বু।

বেরিয়ে যান আমির আলী সাহেব।

নীলা বলে—আমি খেতে পারছি না মনির।

কেনো কি হয়েছে তোমার?

সত্যি হাসানের মতই যদি আব্বুর অবস্থা হয়! তিনি আমার আপন পিতা না হলেও আমি তাকেই যে আপনজন বলে জানি মনির তুমি জানো না আব্বু ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই।

জানি নীলা। আমি সব জানি......আমি কথা দিচ্ছি তোমার আব্বুর জীবনের দায়িত্বভার আমি নিলাম। এবার খাবে তো।

খাবো। নীলা খাবারের থালাটা টেনে নেয় কাছে।

সেদিনই জ্ঞান ফেরার পর নীলার কানে এসেছিলো ছিন্ন মস্তকটার সঙ্গে যে চিঠিখানা ছিলো তার কথা। বয় সবটাই বলেছিলো তার কাছে। চিঠির লেখাগুলো নীলাকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছিলো।

সেইদিন অনেক রাতে খান বাহাদুরের ঘরের পার্শে এসে দাঁড়ালো বনহুর। অন্ধকারে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে রইলো সে। মাত্র কয়েক মিনিট কেটে গেলো দরজা খুলে অতিসন্তর্পণে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো আমির আলী।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিলেন তারপর গবেষণাগারের দিকে এগুলেন তিনি।

বনহুর তাকে অনুসরণ করলো।

গবেষণাগারে প্রবেশ করে এক পাশে একটা মেশিনের সুইচ টিপে দিলো সঙ্গে সঙ্গে মেঝের এক স্থানে একটি সুড়ঙ্গ পথের সিড়ির মুখ দেখা গেলো।

আমির আলী সাহেব সেই সুড়ঙ্গ পথে নেমে গেলেন নিচে!

সংগে সংগে বনহুর এসে দাঁড়ালো সেই জায়গায়।

কয়েক মিনিট দেরী করলো সে।

সুড়ঙ্গ মধ্য হতে কেমন একট শব্দ বেরিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে সুড়ঙ্গ মুখ বন্ধ হয়ে গেলো।

বনহুর দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সমস্ত শরীরে জমকালো ড্রেস। মাথায় পাগড়ী দিয়ে মুখের অর্ধেকটা ঢাকা।

কয়েক মিনিট কেটে গেলো।

বনহুর পূর্বের সেই মেশিনটার পাশের সুইচে চাপ দিলো। সংগে সংগে মেঝেতে সুড়ঙ্গ মুখ বেরিয়ে এলো।

বনহুর কোমরের বেল্ট থেকে রিভলভারটা খুলে নিলো হাতের মুঠায়।

নিচের দিকে নেমে চলছে বনহুর।

দক্ষিণ হাতে তার রিভলভার।

চারিদিকে ঝাপসা অন্ধকার। একটা শব্দ ভেসে আসছে সুড়ঙ্গ অভ্যন্তর থেকে।

এগিয়ে চললো বনহুর চারদিকে লক্ষ্য রেখে।

বেশ কিছুটা এগুতেই হঠাৎ নজরে পড়লো সুড়ঙ্গ মধ্যে কিছু দূরে কতকগুলো লোক একটি মেশিন দ্বারা আরও একটি সুড়ংগ পথ তৈরি করে চলেছে।

মেশিনটা দেখা মাত্র বনহুর চিনতে পারলো এটা সুড়ঙ্গ তৈরির যন্ত্র মেশিন। এ মেশিন তার নিজেরও আছে। ঘন্টায় অর্দ্ধ মাইল সুড়ংগ তৈরি হয় এ মেশিনে।

বনহুর লক্ষ্য করলো সুড়ঙ্গ পথটা এগিয়ে চলেছে কান্দাই জেল অভিমুখে।

একটি গাড়ি অবিরত মাটি বহন করে বেরিয়ে যাচ্ছে সুড়ঙ্গ পথের অপর দিকে। অদ্ভুত ধরণের পোশাক পরা লোক এই গাড়ি চালিয়ে চলেছে।

বনহুর তীক্ষ্ণ নজরে সব লক্ষ্য করে দেখতে লাগলো। কোন উপায়ে সে নিজকে আত্মগোপন করে সব দেখতে লাগলো।

আরও কিছুটা এগুতেই দেখলো বনহুর একটা নীলাভ আলোকরশ্মি দেখা যাচ্ছে। ওদিকে আরও একটা সুড়ঙ্গ পথ আছে। বুঝতে পারলো সে। ওখানে কি আছে দেখবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে উঠে বনহুর। এবার বনহুর উঁবু হয়ে এগুতে লাগলো।

হঠাৎ গাড়িটা এসে পড়ায় বনহুর সুড়ঙ্গ পথের দেয়ালে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

গাড়িটা চলে গেলো পাশ কেটে।

বনহুর এগুলো দ্রুত সেই দিকে যেদিক থেকে নীলাভ আলোক রশ্মি দেখা যাচ্ছিলো।

অল্প এগুতেই দেখলো একটা গবাক্ষ পথে সেই নীলাভ আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসেছে। বনহুর সেই গবাক্ষের পাশে এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি তার চলে গেলো ভিতরে। একটি কক্ষ, কক্ষ মধ্যে তীব্র নীলাভ আলো জলছে। সেই আলোকরশ্মিতে বনহুর দেখতে পেলো কক্ষমধ্যে কয়েকজন মুখোস পরা লোক দাঁড়িয়ে আছে, সবার হাতে এক একটা রিভলভার।

ভালভাবে তাকিয়েই বিস্মিত হলো মুখোস পরা লোকগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে খান বাহাদুর আমির আলী সাহেব। তার মুখমন্ডলে গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে।

রিভলভার ধারীদের একজন বললো—আপনি নীল পাথর খানার বিনিময়ে পেয়েছেন কোটি কোটি টাকা। আরও পেয়েছেন হামবার্টের অসীম সহানুভূতি।

লোকটার কথা শেষ হয় না অপর একজন বলে উঠে—নীলাকে যদি আপনি হামবার্টের হাতে সঁপে না দেন তাহলে বুঝতেই পারছেন আপনার অবস্থাটা....

এবার খান বাহাদুর বলে উঠলেন—যত ভয় দেখাও না কেনো তোমরা, আমি নীলাকে দিতে পারবো না।

এই কি তোমার শেষ কথা।

হাঁ।

অমাবস্যা রাতে আপনি যাবেন না জঙ্গল বাড়ির ঘাটিতে?

যাবো।

বেশ সেদিনের জন্য মালিক অপেক্ষা করবেন। সেদিন আপনি যা ভাল মনে করেন তাই করবেন।

অপর আর একজন বলেন আজও আপনাকে ভাববার জন্য সময় দেওয়া হলো।

খান বাহাদুর কোন কথা বললেন না।

কিন্তু তাকে দেখে অত্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন লাগছে।

এবার লোকগুলো কক্ষ মধ্যের এক পাশে সরে এলো। দেওয়ালের একটা সুইচে হাত দিতেই দেয়ালটা ধীরে ধীরে ফাঁক হয়ে পড়লো। মুখোসধারী লোকগুলো সেই পথে অদৃশ্য হলো।

আমির আলী সাহেব থ'হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বনহুর আলগোছে সেই সময় কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে আমির আলী সাহেবের কাঁধে হাত রাখে।

চমকে উঠেন আমির আলী সাহেব, ফিরে তাকাতেই আরষ্ট হয়ে যান, তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন—তুমি।

হাঁ, দস্যু বনহুর!

তুমি এখানে এলে কি করে?

যাদু মন্ত্রের দ্বারা....

কি চাও বলো।

আজ আপনার কাছে এসেছিলাম আপনার দেহ রক্ষী হিসাবে।

দেহ রক্ষী, আমার।

হাঁ।

তুমি-তুমি...

হাঁ আমি আপনার মঙ্গল চাই। আর সেই কারণেই আমি সদা সর্বদা আপনার পাশে পাশে রয়েছি। যদিও আপনি দেশের কলঙ্ক বা অভিশাপ তবু এতো সহজে আপনাকে মরতে দিতে পারি না কারণ এখনও আপনার অনেক কাজ বাকি আছে।

এতোগুলো কথা এক সঙ্গে বললো বনহুর তারপর যেভাবে এসেছিলো সেইভাবে দ্রুত বেরিয়ে গেলো।

আমির আলী সাহেব থ'মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি কিছু বুঝতে পারলেন না।

যখন ফিরে এলেন তিনি তার গবেষণাগারের মধ্যে তখন তার সমস্ত শরীর ঘেমে নেয়ে উঠেছে। ফ্যাকাশে বিবর্ণ দেখাচ্ছে তাঁকে।

সিড়ির ধাপ বেয়ে উঠে আসছেন আমির আলী এমন সময় এগিয়ে এসে নন্দলাল—মালিক-আপনি।

রংলালকে দেখে প্রথমে চমকে উঠলেন আমির আলী সাহেব তারপর আমতা আমতা করে বললেন—একটু নিচে গিয়েছিলাম। ....আমার শরীরটা কেমন অসুস্থ লাগছে কিনা...

রংলাল বললো—মালিক ধরবো আপনাকে?

হাঁ, ধরে আমার ঘরে একটু পৌছে দাও।

রংলাল তাঁকে ধরে ফেললো তারপর নিয়ে এলো ঘরে। যত্ন সহকারে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চাদরখানা টেনে দিলো আমির আলী সাহেবের গায়ে।

পুলিশ অফিসে বসে মনোযোগ সহকারে কাজ করছিলো মিঃ ইলিয়াস। তার সহকারীগণ নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত।

হঠাৎ টেবিলে ফোন বেজে উঠলো।

রিসিভারটা মিঃ ইলিয়াস তুলে নিলেন হাতে। সঙ্গে সঙ্গে ও পাশ থেকে ভেসে এলো একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর.......হ্যালো মিঃ ইলিয়াস সাবধান অচিরেই জেল থেকে ডাঃ রায় উধাও হবেন কাজেই তাকে জেল থেকে অন্যস্থানে সরিয়ে রাখুন......

পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ ইলিয়াসের মুখমণ্ডলে বিস্ময় ফুটে উঠলো, তিনি বললেন......কে কে বলছেন আপনি......হ্যালো কে আপনি—

শোনা গেলো পুনঃ সেই কণ্ঠ......আমি আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ....বন্ধুজন......আর একটি দিন ডাঃ রায়কে কান্দাই জেলে রাখা সমীচীন মনে করিনা......ধন্যবাদ.....

রিসিভার রাখার শব্দ হলো।

ইলিয়াস সাহেব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে থাকেন কিছুক্ষণ থ'মেরে।

তাঁর সহকারীগণ অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন মিঃ ইলিয়াস সাহেবের দিকে।

মিঃ ইলিয়াস সাহেব বললেন—আশ্চর্য ডাঃ রায় জেল থেকে উধাও হবেন বলে কেউ আমার কাছে ফোন করলো, কিন্তু কে তিনি তা কিছুই জানালেন না।

এমন সময় মিঃ হারুন সেখানে হাজির হলো। মিঃ ইলিয়াসের করমর্দন করে বললেন—ইন্সপেক্টার একটি সংবাদ জানাতে ছুটে এলাম।

সংবাদ? কি সংবাদ মিঃ হারুন?

ঘন্টা খানেক পূর্বে কে বা কারা মিঃ জাফরীর কাছে ফোন করে জানিয়েছে ডাঃ রায়কে আজ সন্ধ্যার পূর্বেই কান্দাই জেল থেকে হাঙ্গেরী কারাগারে নিয়ে যেতে।

মিঃ ইলিয়াস বললেন—এই মুহূর্তে আমার কাছেও কে যেন ফোনে ঐ কথা বলছে জানিনা কে সে। তবে আমি জিজ্ঞাসা করায় ফোনে বললো, আমি আপনাদের হিতাকাঙ্খী বন্ধুজন। জানিনা কি তার উদ্দেশ্য..—একটু থেমে বললেন...চলুন মিঃ হারুন মিঃ জাফরীর ওখানে যাওয়া থাক। সেখানে গিয়ে সব বিষয় আলাপ আলোচনা করা যাবে।

হাঁ তাই চলুন ইন্সপেক্টার সাহেব। বললো মিঃ হারুন।

উভয়ে তখনই উঠে পড়লেন মিঃ জাফরীর অফিসের উদ্দেশ্যে।

অল্পক্ষণেই পৌছে গেলেন মিঃ ইলিয়াস এবং মিঃ হারুন মিঃ জাফরীর অফিসে।

মিঃ জাফরী পায়চারী করছিলেন পুলিশ অফিসারদ্বয়কে দেখে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললেন মিঃ জাফরী—বসুন।

মিঃ ইলিয়াস এবং মিঃ হারুন আসন গ্রহণ করলেন।

মিঃ জাফরীর ললাটে চিন্তা রেখা ফুটে উঠেছে। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আপনারা সবই শুনেছেন বলুন এখন কি করা কর্তব্য? কে সেই ব্যক্তি যে আমাদের সজাগ করে দিয়েছে।

মিঃ হারুন বলে উঠে—এ ব্যাপার সত্য না মিথ্যা তা কি করে বুঝবেন স্যার? তা ছাড়া জেলে এতো কড়া পাহারা ব্যবস্থা সত্ত্বেও ডাঃ রায় কি করেই বা উধাও হবেন?

আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে ব্যাপারটা, অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ তাতে কোন ভুল নাই। বলে থামলো মিঃ ইলিয়াস।

মিঃ জাফরী বললেন—নিশ্চয়ই ব্যাপারটা রহস্যময়। যে ফোন আমি ঘন্টা কয়েক পূর্বে পেয়েছি এবং মিঃ ইলিয়াস আপনিও পেয়েছেন তা দস্যু বনহুর ছাড়া অন্য কারো নয়।

দস্যু বনহুর? অস্ফুট কণ্ঠে বললেন মিঃ ইলিয়াস।

মিঃ হারুন বললো—হাঁ স্যার আমারও সেই রকম মনে হচ্ছে।

মিঃ জাফরী বলেন—দস্যু বনহুরের সহায়তা ছাড়া ডাঃ রায়কে গ্রেপ্তার করা সম্ভব ছিলোনা কারণ ডাঃ রায় আমাদের সকলের চোখে ধুলো দিয়ে স্বচ্ছন্দে তার হত্যালীলা চালিয়ে চলেছিলেন।

হাঁ স্যার ডাঃ রায় এমন নিখুঁত অভিনয় করেছিলেন যার দরুন তাকে খুনি বলে প্রমাণ করা মুস্কিল ছিলো। দস্যু বনহুর কৌশলে তাকে আবিষ্কার করেছিলো। কথাগুলো বললো মিঃ হারুন।

মিঃ ইলিয়াস বললেন—দস্যু বনহুর এখনও ডাঃ রায় এর সম্বন্ধে সব সংবাদ রেখে চলেছে, আশ্চর্য।

মিঃ জাফরী বললেন—আরও বেশি আশ্চর্য ডাঃ রায় জেল থেকে উধাও হবে এ কথা সে জানলো কি করে। নিশ্চয়ই কোন অসম্ভব ঘটনা ঘটতে চলেছে যা এখনও পুলিশ মহল জানতে পারেনি।

হাঁ স্যার আমারও সেই রকম মনে হচ্ছে। না হলে দস্যু বনহুর কিছুতেই এভাবে ফোন করতো না। বললেন মিঃ হারুন।

মিঃ জাফরী একটু চিন্তা করে বলে উঠলেন—ডাঃ রায়কে কান্দাই জেল থেকে অন্যস্থানে যেন না নেওয়া হয় এ জন্য কয়েকদিন পূর্বে আমার কাছে খান বাহাদুর আমির আলী সাহেব এসেছিলেন।

স্যার ডাঃ রায় এর সঙ্গে আমির আলী সাহেবের কি কোন সম্পর্ক ছিলো? বললেন মিঃ ইলিয়াস।

সম্পর্ক বলতে ডাঃ রায় এবং খান বাহাদুর আমির আলী দু'জনা ছোট বেলার বন্ধুলোক এই জানি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সম্পর্কটা শুধু বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ নয় ভিতরে কোন গভীর রহস্যপূর্ণ সম্বন্ধ রয়েছে। কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে থাকলেন মিঃ জাফরী।

মিঃ হারুন বললো—স্যার ডাঃ রায়কে আজই হাঙ্গেরী কারাগারে সরিয়ে ফেলা ভাল বলে মনে হচ্ছে।

হাঁ ইন্সপেক্টার সেই কথা আমিও মনে করছি। নিশ্চয়ই কোন জটিল রহস্য ঘণিভূত হয়ে আসছে। আজই ডাঃ রায়কে কান্দাই জেল থেকে হাঙ্গেরী কারাগারে সরিয়ে ফেলা হোক। মিঃ জাফরী কথাগুলো বলে একটা সিগারেট অগ্নিসংযোগ করলেন।

ঐ দিনই বৈকালে কান্দাই জেল থেকে ডাঃ রায়কে হাঙ্গেরী কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো।

ডাঃ রায় নিজেও এ ব্যাপারে একেবারে ভেংগে পড়লেন। তিনি ভেবেছিলেন মিঃ জাফরী খান বাহাদুর আমির আলীর অনুরোধে তাকে কান্দাই জেল থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলবে না। কিন্তু সব আশা আকাংখা তার বিনষ্ট হয়ে গেলো।

মুষড়ে পড়লেন ডাঃ রায়।

এ সংবাদ জংগল বাড়ি হামবার্টের কানেও গিয়ে পৌছলো।

হামবার্টের দু'চোখে আগুন ঠিকরে বের হলো। সে ফেটে পড়লো বোমার মত, তার অনুচরদের আদেশ দিলো সুড়ঙ্গ খনন কাজ বন্ধ করে দাও।

তৎক্ষণাৎ সুড়ঙ্গ খননের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হলো।

আমির আলী সাহেব যখন সব শুনলেন তখন তার হৃদকম্প শুরু হলো কারণ তিনি জানেন শয়তান হামবার্ট কত বড় দুর্দান্ত নর পিশাচ।

আমির আলী সাহেব উদভ্রান্তের মত হয়ে উঠলেন। হঠাৎ তার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা দিলো।

রংলাল সব লক্ষ্য করছিলো।

সে নিজে এর মূল, ডাঃ রায়কে হাংগেরী কারাগারে নিয়ে যাওয়ার পিছনে তার অদৃশ্য হস্ত কাজ করে চলেছে। মৃদু হাসলো রংলাল আড়ালে দাঁড়িয়ে।

❑

কাল অমাবস্যা।

আজ সমস্ত দিন খান বাহাদুর আমির আলী সাহেব তার গবেষণাগারে বসে কাজ করে চলেছে। কি করছেন তিনিই জানেন।

রংলাল একবার এসে জানালো—মালিক কাল অমাবস্যা ফিরুগাঁও যাবার জন্য আয়োজন করবো কি?

ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন আমির আলী সাহেব—নিশ্চয়ই করবে। মা নীলাকেও বলে দাও রংলাল সে যেন তার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র গুছিয়ে নেয়।

রংলাল ফিরে আসে।

নীলার কক্ষে প্রবেশ করে বলে রংলাল—নীলা কাল অমাবস্যা ফিরুগাঁও যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নাও।

নীলার চোখ দুটো আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠে খুশি ভরা গলায় বলে—মনির এই দিনটির জন্য আমি প্রতিক্ষা করছিলাম।

নীলা তখনই তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করে দিল।

রংলাল তাকিয়ে রইলো ওর দিকে।

ভাবছে রংলাল, নীলা যদি জানতো তার জন্য ফিরুগাঁও এক অভিশপ্ত পুরি তাহলে সে কোন ক্রমেই সেখানে যেতে চাইতোনা। নীলা গুন গুন করে গান গাইছিলো আর সব গুছিয়ে নিচ্ছিলো। রংলাল দেয়ালে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলো তার দিকে।

নীলা বললো—মনির তুমি থাকবে পাশে সত্যি এটা আমার কম আনন্দ নয়। কতবার ফিরুগাঁও গেছি কিন্তু......

বলো থামলে কেনো?
একটু আনন্দ পাইনি, কেমন যেন নীরস মনে হতো সবকিছু।
এবার বুঝি খুব আনন্দ হচ্ছে?
খুব—সত্যি তুমি থাকবে আমার পাশে—পাশে......বন বাদার পর্বতমালা আর ঝর্ণার ধারে ঘুরে বেড়াবো খুব করে। মনির তোমার আনন্দ হচ্ছে না?
উঁ হুঁ!
কারণ?
কারণ বনবাদার পর্বতমালা আর ঝর্ণা আমার অতি পরিচিত। নতুন কিছু হলে আনন্দ পেতাম। তাছাড়া আমি সাহিত্যিক বা কবি নই যে প্রাকৃতিক দৃশ্য আমার মনে রং ধরাবে।
মনির তুমি মাঝে মাঝে বড্ড নীরস কথা বলো। যা শুনলে আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়।
নীলা তুমি সুখীজন তাই সত্য তোমার কাছে নীরস লাগে।
মনির! অভিমান ভরা কণ্ঠে বলে উঠে নীলা।
রংলাল ওর মুখখানা তুলে ধরে বলে—তুমি বড্ড অভিমানী নীলা।
আর তুমি?
অভিমান আমি জানিনা। বলো কোন দিন আমাকে দেখেছো মুখ গোমটা করে বসে থাকতে? কেউ মন্দ কথা বললেও আমি হাসি মুখে তা হজম করে নিয়েছি.......
খুব হয়েছে আর বলতে হবে না যাও নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও গে।
আমার আবার এমন কিইবা জিনিসপত্র আছে যা গুছিয়ে নিতে সময় লাগবে।
তবু চলো আমি গুছিয়ে দেবো সব। বলে নীলা।
রংলাল ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠে—মাফ করুন আপামনি আমার জিনিস আপনার গুছিয়ে দিতে হবে না।
খিল খিল করে হেসে উঠে নীলা।
রংলাল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক চোখে। দিনটা কেটে যায়।
সন্ধ্যা হয়ে আসে।
কাল সকালে ফিরুগাঁও অভিমুখে রওয়ানা দিতে হবে।
আমির আলী সাহেবকে আজ অত্যন্ত বিমর্ষ ম্লান লাগছে।
আর কেউ না জানলেও রংলাল জানে কেনো আজ আমির আলী সাহে এমন মন মরা হয়ে পড়েছেন। সমস্ত মুখ মণ্ডলে তার কালিমা পড়ে গেছে।
রাতে খাবার টেবিলে বসেও তেমন কোন কথাবার্তা তিনি বললেন না।

নীরবে খেয়ে উঠে পড়লেন তিনি।

পরদিন।

যাত্রার আয়োজন চলেছে।

বয় বাবুর্চি এবং রংলাল যাবে আমির আলী সাহেবের সঙ্গে। একজন দারওয়ানও যাবে কারণ সব সময় প্রহরী দরকার। জঙ্গলের জায়গা কখন কি বিপদ আপদ আসে কে জানে। তাই তিনি সব সময় সজাগ থাকেন।

পিছন আসনে আমির আলী সাহেব আর নীলা বসলো।

ড্রাইভিং করে চললো রংলাল নিজে।

দ্বিতীয় গাড়িতে বয় বাবুর্চি আর দারওয়ান এবং প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র।

গাড়ি দুখানা স্পীডে ছুটে চলেছে।

শহরের পথ ছেড়ে এবার গ্রাম্য পথ। তারপর নির্জন প্রান্তর।

উপরে নীল আকাশ।

সম্মুখে প্রশস্ত পথ, শুধু কোমল ঘাস আর পাথরের টিলা। গাড়ি দু'খানা এবার হোচট খেয়ে খেয়ে এগিয়ে চললো।

মাঝে মাঝে ঝর্ণা ধারা বয়ে চলেছে।

খান বাহাদুর আমির আলী সাহেবের গাড়ি দু'খানা যখন ফিরুগাঁও এর সীমানায় প্রবেশ করলো তখন কান্দাই পর্বত মালার উচ্চস্থানে একটি গুহার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখছিলো হামবার্ট।

গাড়ি দু'খানা কি ভাবে এগুচ্ছে এবং গাড়ি দু'খানার মধ্যে কে কি ভাবে বসে রয়েছে সব সে লক্ষ্য করছিলো তীক্ষ্ণ নজরে।

তার দু'পাশে দু'জন অনুচর দাঁড়িয়েছিলো।

তারাও লক্ষ্য করছে সব কিছু।

একজন বলে উঠলো—মালিক নীলার সঙ্গিটি তাদের সঙ্গেই আসছে।

হামবার্ট দাঁতে দাঁত পিষে বললো—কোন ব্যক্তি সেই নরাধম।

দ্বিতীয় জন বললো—প্রথম গাড়িখানাই যে ড্রাইভ করে আসছে।

হামবার্ট পূর্বের মতই কঠিন কণ্ঠে বলে—মৃত্যুর আহ্বানে সে ছুটে এসেছে। এবার কে ওকে রক্ষা করে দেখা যাবে।

মালিক ওরা বাংলার প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে। বললো প্রথম সহকারী।

দ্বিতীয় জন বললো—প্রথম গাড়িখানা বাংলোর ফটকে প্রবেশ করেছে মালিক।

হাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি। যাও তোমরা জঙ্গল বাড়ি ঘাটির একনম্বর গুহায় আমার অবস্থানের ব্যবস্থা করবে। আমি এই গুহায় খান বাহাদুর এবং

তার কন্যা নীলার সঙ্গে মিলিত হবো। কথাগুলো বলে হামবার্ট পর্বত মালার সুউচ্চ শৃঙ্গ থেকে নেমে গেলো।

পর্বতের পাথরে হামবার্টে'র বুটের শব্দ শোনা গেলো খট্ খট্ খট্...

রাত বেড়ে আসছে।

আমির আলী সাহেব কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠছেন।

নীলার মধ্যে কিন্তু কোন পরিবর্তন আসেনি সে খুশিতে উজ্জল হয়ে উঠেছে।

পাশের কামরায় রংলালের শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাওয়া দাওয়ার পর রংলাল চলে গেছে তার নিজের কামরায়।

নীলা নিজের কক্ষে শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিলো।

এমন সময় রংলাল এসে দাঁড়ায়—নীলা চাচা চাচীকে দেখবার বড্ড সখ হয়েছে রাতের মত বিদায় চাই?

নীলা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়—এই এতো রাতে তুমি বাংলোর বাইরে যাবে মনির?

হাঁ নীলা।

তা হয়না, জঙ্গলের যায়গা বিপদ আসতে পারে।

হাসে রংলাল—বিপদ! বিপদ যদি আসে তাতে ভয় পাবার কিছু নাই নীলা।

না আমি তোমায় যেতে দেবোনা মনির। দু'হাতে নীলা ওর জামার কলার চেপে ধরে।

রংলাল বলে—তা হলে কাল সকালে আমায় যেতে হবে। তুমি বলেছিলে না সকালে কান্দাই পর্বত মালার পাদ মূলে বেড়াতে যাবে?

হাঁ।

তা হলে যেতে দাও।

বেশ যাও কিন্তু ভোর হবার আগে চলে এসো কিন্তু।

নিশ্চয়ই আসবো।

আব্বুকে বলবেনা?

বলবো। তাঁকে না বলে যাবো, তা হয়না।

আচ্ছা যাও।

রংলাল স্থির নয়নে তাকিয়ে থাকে নীলার মুখের দিকে।

নীলা হেসে বলে—কি দেখছো মনির?

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে রংলাল—কিছু না। তারপর বেরিয়ে যায় নীলার কক্ষ থেকে।

খান বাহাদুর সাহেব তার কক্ষ মধ্যে পায়চারী করে চলেছেন, চোখে মুখে তার উদ্বিগ্নতার ছাপ।

রংলাল দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করে ডাকে—মালিক।

খান বাহাদুর আমির আলী যেন আচমকা চমকে উঠলেন। —কে রংলাল?

হাঁ মালিক।

তুমি এতো রাতে, কি চাও!

মাথা চুলকে বলে রংলাল—মালিক চাচা চাচীকে এক নজর দেখতে যাবো। কাল সকালে সময় পাবো না তাই...

একটু ভেবে বললেন আমির আলী সাহেব—বেশ যাও!

কথাটা বলে তিনি পুনরায় পায়চারী করতে শুরু করলেন। রংলাল বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

খাবার সময় সবার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলো রংলাল। দারওয়ান বাবুর্চি বয় সবাইকে সে বললো—চাচা চাচীকে দেখতে যাচ্ছি।

এতো রাতে বাংলোর বাইরে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয় বললো ওরা।

কিন্তু রংলাল কারো নিষেধ শুনলো না। সে হাসি মুখে বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

ক্রমেই রাত বাড়ছে।

বাংলোর দেয়াল ঘড়ি রাত একটা ঘোষণা করলো।

তারপর রাত দু'টো।

রাত তিনটা।

আমির আলী সাহেব বারবার দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। চোখে মুখে তার একটা দারুন উৎকণ্ঠার ভাব ছড়িয়ে পড়েছে।

এমন সময় একটা গাড়ি ডাক বাংলোর সম্মুখে এসে থামলো।

গাড়ি থেকে নামলো দু'জন অদ্ভুত পোশাক পরা লোক। তারা এগিয়ে চললো বাংলো অভিমুখে। আমির আলীর কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে দু'জন দাঁড়ালো তার দু'পাশে।

আমির আলী সাহেব প্রথমে হতভম্ভ হলেও পরক্ষণে নিজকে সামলে নিলো কিন্তু কোন কথা বললেন না।

লোক দু'জনের একজন বললো—চলুন আমরা আপনাকে নিতে এসেছি।

অপরজন বললো—নীলা সহ চলুন।

আমির আলী সাহেব ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগলেন, মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠেছে। কোন জবাব তিনি দিলেন না।

লোক দু'জনের প্রথম জন আবার বললো—এই দণ্ডে রওয়ানা না দিলে আমরা আপনাকে জোরপূর্বক নিয়ে যাবো।

জোরপূর্বক নিতে হবে না আমি অমনিই যাচ্ছি কিন্তু নীলাকে সংগে নিবোনা। কথাগুলো গম্ভীর এবং দৃঢ় গলায় বললেন আমির আলী সাহেব।

লোক দুটির দ্বিতীয় জন বললো—নীলাকে না নিয়ে আমরা যাবোনা খান বাহাদুর। মালিকের আদেশ অমান্য করা আমাদের সাধ্য নয়। বলুন যাবেন কিনা?

অপরজনও বলে উঠলো—বলুন যাবেন কিনা?

না।

সত্যি বলছেন?

হাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন দু'পাশ থেকে ধরে ফেলে খান বাহাদুর আমির আলীকে। লৌহ শিকলে আবদ্ধ করে ফেলে তাকে। তারপর টেনে নিয়ে চলে পাশের ঘরের দিকে।

নীলার ঘুম ভেংগে যায় ধড়মড় করে বিছানায় উঠে। বসেই তার চক্ষু স্থির দেখতে পায় তার আব্বুকে লৌহ শিকলে আবদ্ধ করে মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন নর শয়তানের মত ভয়ঙ্কর লোক।

নীলা আরষ্ট হয়ে গেছে যেন কিছু বলতে পারে না দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

লোক দু'জন এবার নীলাকে ধরতে যায়।

নীলা বলে উঠে—খবরদার আমাকে স্পর্শ করোনা। বলো কে তোমরা? আমার আব্বুকে অমন করে বেঁধেছো কেনো?

সব জানতে পারবে নীলা। বললো একজন লোক।

অপরজন বললো—তোমার আব্বু তোমাকে বিক্রি করে দিয়েছে।

আমির আলী সাহেব চিৎকার করে উঠেন—মিথ্যা কথা। সব মিথ্যা কথা———

ততক্ষণে ওরা দু'জন নীলাকে ধরে ফেলেছে। তুলে নিলো ওরা ওকে হাতের উপর।

নীলা হাত পা ছুড়ে চিৎকার করে ওদের কবল থেকে নিজকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু সে একটি তরুণী দু'জন বলিষ্ঠ পুরুষের সংগে পেরে উঠা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

নীলাকে ওরা গাড়িতে তুলে নিলো।

পাশের আসনে খান বাহাদুর আমির আলীকে লৌহ শিকলে আবদ্ধ অবস্থায় বসিয়ে নিলো ওরা।

গাড়ি ছুটতে শুরু করলো।

অদ্ভুত গাড়ি উঁচু নীচু টিলা পথে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চললো। ঝোপ ঝাড় আগাছা কিছু বাধলোনা। গাড়ির সম্মুখে।

গাড়ির হেড লাইট দুটো অন্ধকারে অজগরের চোখের মত দেখাচ্ছে। লাইটের উপরিভাগ কালো আবরণে ঢাকা থাকায় আলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছেনা।

স্পীডে চলেছে গাড়িখানা।

গাড়ির মধ্যে নীলার মুখে রুমাল বাধা থাকায় সে কোন রকম চিৎকার করতে পারছেনা। হাত দু'খানাও তার পিছ মোড়া করে বাঁধা।

আমির আলী সাহেব অসহায় বেচারীর মত কাৎ হয়ে পড়ে আছেন পিছন আসনে। তার মুখেও ওরা রুমাল বেঁধে নিয়েছে।

ঘন্টা দুই চলার পর কান্দাই পর্বত মালার পাদদেশে এসে গাড়ি খানা থেমে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো লোক দু'জন। তারপর নীলাকে একজন তুলে নিলো কাঁধে।

খান বাহাদুর সাহেবকে একজন ধরে টেনে নামিয়ে নিলো নিচে। তারপর জোর পূর্বক নিয়ে চললো তাঁকে।

নীলার হাত দু'খানা বাধা থাকায় সে কোনরকম নড়া চড়া করতে পারছেনা! পা দু'খানা ছুড়তে লাগলো শুধু।

পর্বতমালার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে একটা সুড়ঙ্গ পথ। নীলা এবং আমির আলী সাহেবকে নিয়ে সেই সুড়ঙ্গ পথে লোক দু'জন এগিয়ে চললো।

কিছুটা এগুতেই গভীর গর্ত নজরে পড়লো।

পাশেই একটি লিফট্।

লোক দু'জন আমির আলী এবং নীলাকে নিয়ে লিফ্টার উপরে উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে লিফট্টা গর্তটার মধ্যে নেমে চললো।

চারিদিকে শুধু জমাট অন্ধকার।

কিছুক্ষণ ধরে লিফট নামলো। হঠাৎ একটা উজ্জল আলো নজরে পড়লো তাদের।

লিফট্ থেমে গেছে।

এবার লোক দু'জন আমির আলী ও নীলা সহ লিফট্ থেকে নেমে পড়লো।

আবার সুড়ঙ্গ পথ।

উজ্জল আলোটা সুড়ঙ্গ পথের মুখেই জ্বলছিলো।

আবার অন্ধকার।

নীলাকে কাঁদে করে এগিয়ে চলেছে প্রথম লোকটি।

দ্বিতীয় লোকটি আমির আলীকে টেনে হিঁছড়ে নিয়ে চলেছে। বার বার তিনি হোচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছেন তবু পুনরায় উঠে আবার চলছেন।

নিরুপায় অসহায় তিনি এই মুহূর্তে তার কোন উপায় নাই নিজকে রক্ষা করে বা নীলাকে উদ্ধার করেন তিনি।

নীলা তাকিয়ে দেখে অন্ধকারে তাকে নিয়ে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে পিতার যন্ত্রণাময় আর্তকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। নিলা বুঝতে পারে এই সেই জঙ্গল বাড়ি ঘাটি।

আরও কিছুক্ষণ চলার পর একটা বিরাট গুহার মধ্যে প্রবেশ করলো লোক দু'জন আমির আলী সাহেব ও নীলা সহ।

জমাট অন্ধকার থেকে আলোর বন্যায় প্রথমে চোখ দুটো ধাঁধিয়ে গেলো যেন। নীলাকে নামিয়ে দিলো লোকটা কাঁধ থেকে নিচে।

আমির আলী সাহেবকেও এনে দাঁড় করানো হলো।

সংগে সংগে একটা গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বর—খান বাহাদুর।

নীলা সম্মুখে চোখ দুটো তুলে ধরলো অমনি তার মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠলো যেন। সে দেখতে পেলো একটি জীবন্ত শয়তান দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা তাদের দিকে তাকিয়ে কটমট করে হাসছে।

শিউরে উঠলো নীলা।

আমির আলী সাহেবের মুখের বন্ধন খুলে দেওয়া হলো। নীলার মুখের রুমাল খানাও খুলে দিলো ওরা।

আমির আলী সাহেব রীতিমত হাঁপাচ্ছেন।

নীলা একবার শয়তানগুলোর মুখে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে পিতার দিকে তাকালো। অসহায় আমির আলীর মুখখানাকে বড় করুণ লাগছে।

গর্জে উঠলো শয়তান—খান বাহাদুর এখন নীলাকে আমার হাতে তুলে দিতে তোমার আপত্তি আছে?

আমির আলী সাহেব গর্জে উঠলেন—হামবার্ট যতক্ষণ আমি নীল পাথর হাতে না পাবো ততক্ষণ আমি নীলাকে তোমার হাতে তুলে দেবো না।

অট্টহাসিতে ভেংগে পড়লো হামবার্ট তারপর বললো—নীল পাথর দেবো তারপর তুমি নীলাকে আমার হাতে তুলে দেবে কিন্তু তোমাকে যদি হত্যা করি তা হলে তুমি বাধা দিতে পারবে?

আমির আলী নীরব।

এখন তোমার জীবন আমার হাতের মুঠায়, কাজেই তুমি যদি জীবনে বাঁচতে চাও তাহলে নীলাকে বিনা দ্বিধায় আমার হাতে সমর্পণ করো। নচেৎ মৃত্যু তোমার অনিবার্য...

মরতে আমার ভয় নেই হামবার্ট———

তা জানি কিন্তু নীলাকে দিতে তোমার এতো দ্বিধা কেনো? নীলা তোমার কন্যা নয় তবু তুমি তাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাও কেনো?

নীলা স্তব্ধ হয়ে শুনছিলো, এক্ষণে তার মনে পড়ে রংলালের কথা সে বলেছিলো খান বাহাদুর আমির আলী তার পিতা নয়। কথাটা সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলেও মনে প্রাণে সে কথাটাকে গ্রহণ করতে পারেনি। আজ শয়তান হামবার্টের মুখে ঐ উক্তিটা তাকে ভাবিয়ে তুললো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো নীলা খান বাহাদুর আমির আলীর মুখের দিকে।

আমির আলী বললেন—নীলা আমার কন্যা না হলেও আমি তাকে আপন কন্যার মত স্নেহ করি। তা ছাড়া নীলাও জানে আমি তার পিতা। কিন্তু আমার জীবন গেলেও আমি তাকে তোমার হাতে তুলে দেবোনা।

কারণ? বললো হামবার্ট।

কারণ ডাঃ রায় নীলাসহ নীল পাথর আমায় দিয়েছিলেন তুমি সে নীল পাথর নিয়েছো।

কিন্তু আমি তোমায় কোটি কোটি টাকা দিয়েছি তুমি কথাও দিয়েছিলে নীলাকে দেবে!

না আমি কথা দেইনি। আমি নীলাকে দেবো না একথা দেয়নি———

খান বাহাদুর কথা না দিলেও নীলাকে তোমার দিতে হবে নীলার বিনিময়ে তুমি পাবে তোমার জীবন আর তোমার ল্যাবরেটরি যা থেকে তুমি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করো।

না আমি কিছুতেই নীলাকে দেবোনা। দৃঢ় কণ্ঠস্বর খান বাহাদুরের।

আবার অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ে হামবার্ট, হাসি থামিয়ে বলে—জমপুরিতে দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে সাহস হয় খান বাহাদুরের।

এবার নীলা বলে উঠে—শয়তান আব্বুকে হত্যা করতে পারো কিন্তু মনে রেখো আমাকে তুমি পাবে না।

হাঃ হাঃ হাঃ নীলা তুমি হয়তো আমার নাম শুনেছো কিন্তু আমাকে তুমি দেখোনি তাই এমন কথা বলতে পারলে। বহুদিন থেকে আমি তোমার জন্য প্রতিক্ষা করছি। কারণ তুমি ছোট ছিলে আমিও তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম......নীলা কেউ তোমাকে আমার এ জংগল বাড়ি ঘাটি থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। তোমাকে আমি চাই.... হামবার্ট দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে এলো নীলার দিকে।

সেকি ভয়ঙ্কর মূর্তি নর পশুর।

দু'চোখে তার লালসাপূর্ণ চাহনী।

বললো আবার হামবার্ট—নীলা শুধু তোমার জন্য আমি শত শত ব্যক্তিকে হত্যা করেছি......তুমি আমার হৃদয়ের রাণী...

নীলার দু'হাত পিছ মোড়া করে বাঁধা তবু সে পিছু হটছে।

খান বাহাদুর আমির আলী সাহেব রাগে ক্ষেভে অধর দংশন করছেন। তাঁরও হাত দু'খখানা বাঁধা রয়েছে পিছ মোড়া করে।

হামবার্ট হাত দু'খানা প্রসারিত করে নীলাকে ধরে ফেলে।

নীলা চিৎকার করে উঠে—আব্বু আমাকে বাঁচাও...

ঐ মুহূর্তে একটা বজ্র কঠিন কণ্ঠস্বর শোনা যায়—হামবার্ট নীলাকে মুক্ত করে দাও—

সংগে সংগে হামবার্ট নীলাকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে তাকায়। গুহার মধ্যে সবাই চমকে উঠে তারাও ফিরে তাকায় পিছনে। দেখতে পায় অদূরে গুহার মুখে দাঁড়িয়ে আছে জমকালো পোশাক পরা একটি ছায়ামূর্তি।

এক সংগে খান বাহাদুর আমির আলী এবং নীলা বলে উঠে—দস্যু বনহুর।

হামবার্ট অগ্নিমূর্তি ধারণ করে তাকিয়ে আছে ছায়ামূর্তির দিকে তার কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে আসে—দস্যু বনহুর।